পাপ
আদি থেকে অনন্ত
সৌরভ চক্রবর্তী

ভারতীয় উপমহাদেশের মতো ধর্ম ভীরু স্থানে কথায় কথায় পাপ-পুণ্যের হিসেব কষা হয়। হিসেবের জন্য স্বয়ং চিত্রগুপ্তকে নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু পাপ নিয়ে আলাদা করে পড়তে চাইলে বাংলা সাহিত্যে কোনো গল্প সংকলন নেই। এই চিন্তাটা আসা মাত্রই এই গ্রন্থের পরিকল্পনা।

এই গ্রন্থের প্রত্যেকটা গল্প কোনো না কোনো পাপ কার্যকে ইঙ্গিত করছে। কখনো রহস্যের আড়ালে, কখনোও রোমাঞ্চের আবডালে সেই পাপ এসে গলা জড়িয়ে ধরে। কখনোও সেই পাপ কার্য করতে মনে আনন্দের উন্মেষ ঘটে আবার কখনো সেই পাপ কার্যই হয়ে উঠে জীবনের চরমতম ভুল।

কিছু অকল্পনীয় প্লটের গল্প এই গ্রন্থে সংকলিত হলো যা হয়তো বাস্তবে প্রায় অসম্ভব। কিন্তু যদি সেগুলো কোনোদিন বাস্তবে ঘটে তবে পরিস্থিতি ঠিক কতটা চরম হতে পারে তার দলিল এই কাহিনিগুলো।

পাঠককে ভিন্ন স্বাদের সঙ্গে পরিচয় করাতেই গল্পগুলো লেখা। বিনোদনের পাশাপাশি কাহিনিগুলো পাঠকদের এনে দাঁড় করাবে এক একটা চরম পরিণতির সামনে। সেখানেই পাঠক ভাবতে বসবেন যে জীবনে শত সহস্র পাপ কার্যের প্রলোভন থাকা সত্বেও কিভাবে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। সেখান থেকেই পাঠককে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। সেখান থেকেই জন্ম হবে এক একটা নতুন কাহিনির।

ভয়ঙ্কর গভীর পাপ-সায়রে ডুব দিতে পাঠক প্রস্তুত তো!

পা প

সৌরভ চক্রবর্তী

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

Paap
by Sourav Chakraborty

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০২৩

প্রচ্ছদ ঃ স্বর্ণাভ বেরা
অলঙ্করণঃ কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

প্রকাশক
বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন
১১/৮/১ কে রোড, কোলকাতা ৭০০ ১২২

যোগাযোগ
৯০৭৩৪২৩৯৬৩

মূল্য
₹ ২৯৯.০০

উ ৎ স র্গ

বিদ্যালয় জীবনের সহপাঠী তথা ভ্রাতৃপ্রতিম অভিক পাল-কে। অনেক পথ চলা বাকি। স্মৃতি অক্ষয় হোক। বন্ধুত্ব অটুট থাকুক।

ভূ মি কা

এক শীতের সন্ধেতে বসে হঠাতই এই বইটা তৈরি করার কথা মাথায় এসেছিল। সেদিন ঘাঁটছিলাম বিভিন্ন রকম গল্প-সংকলন। ভূতের গল্প-সংকলন, মার্ডার মিস্ট্রি, বিভিন্ন রকমের রহস্য গল্প-সংকলন এমনকি প্রেমের গল্প সংকলন— আমাদের বাংলায় কোনোপ্রকার গল্প-সংকলনের অভাব নেই। কিন্তু অনেক খুঁজেও সেই কুয়াশাঘন সন্ধেতে আমার সংগ্রহে কোনো পাপের গল্প সংকলন খুঁজে পাইনি। সঙ্গে সঙ্গে কলেজ স্ট্রিটে ফোন লাগাই, সেখানে আমার অনেক সুহৃদ আছেন। ওদের সঙ্গে আলোচনা করি। কিন্তু না, পাপের গল্প নিয়ে কোনো সংকলন আমাদের বাংলায় এর আগে প্রকাশিত হয়নি। তাই আমিও খুঁজে পাইনি।

আমাদের মতো ধর্মভীরু দেশে যেখানে কথায় কথায় পাপ-পুণ্যের দোহাই দেওয়া হয়, পাল্লা-বাটখারায় মাপা হয় সমস্ত কাজকে, এমনকি চিত্রগুপ্তের মতো খাস লোক নিযুক্ত করা রয়েছে পাপের হিসেব রাখার জন্য, সেই দেশেই কিনা পাপের গল্পের সংকলন নেই! এদিকে বিদেশে পাপ অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে 'সিন' বলে তা নিয়ে প্রচুর লেখালিখি। ওদের চিত্রগুপ্ত নেই, কিন্তু গল্প-সংকলন আছে। এই অন্যায় আমার পক্ষে মানা সম্ভব হল না। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলাম যে আমাদের দেশেও সেরকম একটা সংকলন থাকবে। কেউ যখন লেখেনি, আমি নিজেই লিখব সেটা। তারপরেই কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম এই গুরুদায়িত্ব।

যাক, মজার ছলে অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয়কে কিছুটা সরল করতে পারলাম বোধহয়। এবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি বরং। পাপ এবং পুণ্য আসলে দুটো দৃষ্টিভঙ্গি। আমার কাছে যা পাপকর্ম, সেটাই হয়তো কারও কাছে পুণ্য অথবা কোনো যুক্তিযুক্ত কর্ম। আবার উলটোটাও সত্যি। তবুও আমাদের আইনব্যবস্থার চোখে, এমনকি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতেও কিছু কিছু অপকর্মকে পাপকার্য বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা হত্যার কথা বলতে পারি। মানবহত্যা হোক বা পশুহত্যা, যে-কোনো সাধারণ পরিস্থিতিতে সেটা একটা পাপকার্য। কাউকে খুন করা, ধর্ষণ করা ইত্যাদি কাজগুলোর পিছনে খুনি কিংবা ধর্ষকের যা'ই উদ্দেশ্য থাকুক না কেন, তা কখনও পুণ্য বলে ধরা যেতে পারে না।

বিভিন্ন রকমের পাপ সংঘটিত হয়েছে এই গ্রন্থের গল্পগুলোতে। সেই পাপগুলো নিয়ে বিস্তারিত এই ভূমিকায় আলোচনা করব না। আশা করি গল্পের মাধ্যমেই সেগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছবে। তবে এই গ্রন্থে, বিদেশে যেটাকে 'সেভেন সিন' বা সাত রকমের পাপ বলে, সেই বিষয়টিকে আলাদাভাবে আমি ইচ্ছে করেই তুলে ধরার চেষ্টা করিনি। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের বিশেষত আমাদের বাঙালি পাঠকের উপযুক্ত করে গল্পগুলো পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি।

সহজ-সরল কিছু চরিত্রের পাশাপাশি ঝাঁ-চকচকে কিছু চরিত্রও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। *পাপ ও পয়োস্বিনী*-র মতো অকল্পনীয় একটা বিষয়কে নিয়ে লিখেছি। যে বিষয় হয়তো বাস্তবে কোনোদিন ঘটবে না। কিন্তু লেখক হিসেবে আমাদের গল্পের প্লটের সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয়। পাঠকদের এরকম নিত্যনতুন প্লটের গল্প ভালো লাগে। এর পাশাপাশি *মামলার শেষে*-র মতো কোর্টরুম ড্রামা স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। এটিও বাস্তবে প্রায় অসম্ভব এক প্লট। এরকম আটটি কাহিনি নিয়ে গড়ে উঠেছে এই গ্রন্থ। যেখানে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমি অভিনব প্লটের সাহায্য নিয়েছি। কতটা সফল হয়েছি সেটা আপনাদের মতামত যখন শুনব তখন বুঝতে পারবো।

এই গ্রন্থের আটটি কাহিনি বিগত পাঁচ বছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সেগুলোকে একত্রিত করা হল এই গ্রন্থে। এই আট কাহিনিকে একটা সুতোয় বেঁধেছে— পাপ। আর এভাবেই গড়ে উঠেছে আক্ষরিক অর্থে পাপের গল্প-সংকলন।

গ্রন্থটির পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রকাশক শ্রী নীলাদ্রি মুখোপাধ্যায়ের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি যেভাবে এই গ্রন্থ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পাঠকদের কাছে নিয়ে এলেন তা এক কথা তারিফযোগ্য। একই কথা প্রযোজ্য গ্রন্থটির অলংকরণ শিল্পী শ্রী কৃষ্ণেন্দু মণ্ডলের জন্য। ভালোবাসা জানাই তাঁদের।

ভবিষ্যতে এই গ্রন্থ বাংলাদেশের পাঠকের হাতেও পৌঁছবে। বাংলাদেশের পাঠকদের আমার লেখক জীবনের শুরুর সময় থেকে পাশে পেয়েছি। ওদের জানাই একরাশ ভালোবাসা।

এই গ্রন্থের শেষ মুহূর্তের কাজ যখন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চলছিল, তখন আমার পরিবার যেভাবে আমার পাশে থেকেছে তার জন্য আমি আমার পরিবারের সকলকে ভালোবাসা জানাই।

পরিশেষে বলি, পাপ কার্য থেকে বিরত থাকাটাই মানুষ হিসেবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই কাহিনিগুলো সেই ইঙ্গিতবাহী।

আর কী, পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে, এবার ঘড়ার জল পান করুন প্রিয় পাঠক!

পাঠ শুভ হোক।

ধন্যবাদান্তে,
সৌরভ চক্রবর্তী
কলকাতা
১৪ জানুয়ারি, ২০২৩
authorchakraborty.sourav@gmail.com

এই গ্রন্থ প্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রাপ্তমনস্কদের জন্য। কোনো পরিবার অথবা সম্প্রদায় অথবা কোনো সাধক কিংবা কোনো সাধারণ ব্যক্তি (জীবিত কিংবা মৃত)-কে আঘাত করার ইচ্ছে নিয়ে এই গ্রন্থ লেখা হয়নি। এই গ্রন্থের কোনো ঘটনা সত্য হবার দাবি লেখক করছেন না। কিছু ঐতিহাসিক চরিত্রের উপস্থিতি এবং স্থানের উল্লেখ ব্যতীত কাহিনিগুলোর সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক। কিছু কাহিনি সত্য ঘটনা এবং কল্পনার মিশেলে তৈরি। তবে সম্পূর্ণ কাহিনির সঙ্গে কোনো বাস্তব ঘটনা বা ব্যক্তির সরাসরি মিল শুধুমাত্র কাকতালীয় একটি ঘটনা হবে।

সূ চি প ত্র

১৫
পাপ ও পয়স্বিনী

৬৫
মামলার শেষে

৮৯
খেলনাওয়ালা

৯৭
শৌখিন রাত

১০৯
রোস্টেড চিকেন

১১৭
আস্তিক

১৩৫
লাস্যময়ী

১৪৭
সুইসাইড টাওয়ার

পাপ ও পয়স্বিনী

উত্তর কলকাতার এক প্রায় নির্জন নির্বান্ধব প্রান্তরে ইদানীং একটি ফ্যাক্টরি হয়েছে। শোনা যায় অনেক আগে এখানে শহরের বর্জ্য জমা হত। তারপর বর্জ্য জমা করার জায়গা পরিবর্তন হয়। অল্প দামে কোনো এক ব্যবসায়ী সে জায়গা কিনে নেয়। তারপর আরও অনেক হাতবদল। বর্তমানে জায়গার মালিকের নাম বোধহয় কোম্পানির সাধারণ চাকুরেরা অব্দি জানে না। আশেপাশের লোকজন শুধু জানে এই ফ্যাক্টরির গেট দিনের আলোতে দু'বার খোলে। এক ভোরে, দুই বিকেলবেলায়। বেশ কিছু বোঝাই করা ট্রাক বেরিয়ে পড়ে সেই গেট ধরে এবং শহর কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে।

আর একটা কথা বলে রাখা ভালো। ইদানীং শহরে দুধের বিক্রি ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। নাহ্, গোরুর বা মহিষের দুধের নয়, মানুষের দুধের। প্যাকেটজাত হয়ে বিকোচ্ছে ব্রেস্ট মিল্ক। হ্যাঁ, এক্সপায়ারি ডেটটাও নাকি লেখা থাকে তাতে।

১

সাতটা বেজে গেছে প্রায়, মর্নিং ওয়াক শেষ। ইয়ারপ্লাগ কানে গুঁজে পছন্দের গান চালিয়ে বাড়ির রাস্তা ধরে তিয়াষ। পরনে কালো ট্র্যাকস্যুট আর কালো স্লিভলেস টপ। পকেটের মধ্যে ফোন ভাইব্রেট করতেই ব্লুটুথে রিসিভ করে তিয়াষ। মায়ের ফোন।

- হ্যাঁ মা, বলো।

জগিং করতে করতেই কথা বলতে থাকে সে।

- কোথায় আছিস?

- পৌঁছে গেছি প্রায়।

- আসার সময় তপনজ্যেঠুর দোকান থেকে এক প্যাকেট দুধ নিয়ে আসিস তো। ফ্রিজে নেই। তোর বাবা এখুনি উঠে দুধ চায়ের জন্য ঘর মাথায় তুলবে।

- আচ্ছা।

ফোন কেটে দেয় সে। মোড়ের মাথায় তপনজ্যেঠুর দোকান এই সময় খালিই থাকে। দোকানে গিয়ে এতদিনকার পছন্দের

ব্র্যান্ডের গোরুর দুধ নিয়ে নেয় তিয়াষ। এই দোকানে মাসের শেষে একসঙ্গে পেমেন্ট হয়। তাই দুধ নিয়েই ফ্ল্যাটের দিকে পা বাড়ায় সে।

দোকান থেকে যে'ই না কিছুটা এগিয়েছে, মোড়ের মাথায় কিছু ছেলেকে দেখতে পায় সে। ওপর থেকে নিচ অব্দি এরা তিয়াষকেই মাপছিল। তিয়াষ স্বভাবসুলভ এদের পাত্তা না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে আসার সময় একজনকে বলতে শোনা যায়,

- গোরুর না মানুষের?

তিয়াষ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল। কানে এখন গানটাও আর বাজছে না। তাই কথাটা শুনতে পায় সে। একবার থামে কিন্তু সকাল সকাল মেজাজটা চড়াতে চায় না সে। আবার হাঁটতে থাকে। আবার শোনা যায় একই গলায়,

- না কি নিজের? প্যা-কে-ট করা?

নাহ্, এবার আর কিছু করার থাকে না। ঘুরে তাকায় তিয়াষ এবং গটগট করে ছেলেগুলোর সামনে এসে দাঁড়ায়। কিছুটা হকচকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় ছেলেগুলো। এতটা আশা করেনি তারা। যে বলেছিল কথাগুলো তার দিকে কিছুটা ঝুঁকে হাতের প্যাকেট উঁচিয়ে তিয়াষ উত্তর দেয়,

- তোর মায়ের। বিশ্বাস না হলে খেয়ে দেখতে পারিস। স্বাদ মনে পড়ে যাবে।

এতটাই জোরে বলে যে রাস্তার লোকজন তাকিয়ে থাকে ছেলেটির দিকে। কথাটা শেষ করে আর দাঁড়ায় না তিয়াষ। হনহন করে ফ্ল্যাটের দিকে হাঁটতে থাকে।

পেছনে অন্য ছেলেগুলোর মধ্যে একজনকে বলতে শোনা যায়,

- আরও খচাতে যা তিয়াষ ব্যানার্জিকে। পাড়ার এক নম্বর পিস!

বাড়ি পৌঁছে ফ্রেশ হয়ে চায়ের কাপ হাতে ড্রইংরুমে এসে বসে সে। বাবা পত্রিকা পড়ছেন। সে টিভি খুলে খবরের চ্যানেলটা ধরল। মা হাতে কী একটা কাজ করছিলেন। বললেন,

- এই হয়েছে, বাপ পত্রিকায় খবর খুঁজবে আর মেয়ে টিভিতে। কেন যে জার্নালিস্টকে বিয়ে করেছিলাম!

হালকা ফোড়ন কেটে কথাটি বলেই রান্নাঘরে চলে যান তিয়াষের মা।

তিয়াষ জবাব দেয়,

- মেয়েকেও মাস কম নিয়ে পড়াশোনা করানোর সিদ্ধান্ত কিন্তু তোমারই ছিল, বাবার নয়।

- ছাড় তো তোর মায়ের কথা। এইটা পড়।

তিয়াষের বাবা পত্রিকাটা এগিয়ে দিলেন। রাজ্যের প্রথমসারির এই পত্রিকার প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো করে লেখা আছে— *'মা' ব্র্যান্ডের দুধ এবার শহর ছাড়িয়ে মফস্‌সলের পথে, শীঘ্রই শেয়ার বাজারে আসছে স্টক।*

আর্টিকেলটা গোটা পড়ে পত্রিকা ফেরত দেয় তিয়াষ,

- আমাদের টিমও আজ বা কালের মধ্যেই এদের নিয়ে কিছু একটা নিউজ করবে শুনেছি। হয়তো আজই মিটিং হবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস না কি একজন মালিক, সেটাই ধোঁয়াশা। কর্মচারীরাও শুনেছি সেভাবে কিছুই জানে না। কীভাবে কী হয়, কিছুই আমরা জানি না। ফ্যাক্টরির ঠিকানা আছে কি নেই জানি না, কিন্তু থাকলেও শুনেছি তাতে প্রবেশাধিকার নেই। প্রচুর বিক্রি এদের, প্রফিট মার্জিনে অন্যান্য কোম্পানি এদের আশেপাশেও থাকবে না। শহর কলকাতা যে কীভাবে এরকম নতুন একটা কনসেপ্টকে এত তাড়াতাড়ি গ্রহণ করে নিল সেই নিয়েই মিডিয়ায় হট্টগোল শুরু হয়েছে।

- এসব না ভেবে মুদ্রার অন্যদিকটা ভেবেছিস কখনও?

- কোন দিক?

- এত এত প্যাকেট ব্রেস্ট মিল্ক কীভাবে আসছে, কাদের থেকে আসছে? তারা কি সেখানে এমপ্লয়ি, না কি...

বাবার কথা শুনে কোঁচকানো ভ্রু সোজা হয় তিয়াষের, মেরুদণ্ড হয় টানটান।

- তোর বয়সে একটা ছোটো লিড পেলেও মনটা চনমনে হয়ে উঠত, আর এইটা একটা আস্ত লিডের গোদামঘর। শেকড় অব্দি যাওয়ার চেষ্টা করিস। কেরিয়ার সেট হয়ে যাবে।

বাবা উঠে স্নান করতে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে তিয়াষের পিঠে দু'বার ট্যাপ করলেন। তিয়াষ জানে এ ট্যাপ ভরসার। মানুষটা এমনিই এমনিই পঁয়ত্রিশ বছর জার্নালিজম করেননি, নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে এই নিউজে। নইলে এভাবে বলতেন না। উঠেপড়ে লাগতে হবে এবার।

২

রাতেরবেলা টহলদারির চূড়ান্ত ব্যবস্থা রাখা হয় ফ্যাক্টরিতে। বাইরে থেকে কোনো ব্যক্তি বা গাড়ি এমনকি কোম্পানির ট্রাকের প্রবেশাধিকার অব্দি নেই। শুধুমাত্র একটি স্পেশাল ভ্যান গাড়ি ঢুকতে পারে। তা'ও মাসের বিশেষ কিছুদিনে। আগে থেকে বলে দেওয়া হয় গার্ডদের সেসব তথ্য। গৌতম সবেমাত্র জয়েন করেছে। সিনিয়রদের থেকে ধীরেসুস্থে এসব জেনে নিচ্ছিল সে।

একজন বলল,

- আজকে সেই ভ্যান আসার কথা। এগারোটা বাজে। এখুনি আসবে বোধহয়।

গৌতম জিজ্ঞেস করে বসে,

- ভ্যানে কী আসে, দাদা?

'দাদা' লোকটা চোখ গোল গোল করে তাকায়।

- এই, তোকে কে নিয়েছে বল তো? শুরুতেই বলে দেয়নি যে এখানে প্রশ্ন করা বারণ?

- তা দিয়েছে। তবু...

- কোনো তবু নেই। যা বলবে তাই করবি, মাস গেলে মাইনে নিবি। আর মনে রাখিস, কোথায় কাজ করিস তা বলাও বারণ। যদি বলিস আর সেটা কোম্পানি জেনে যায় চাকরি তো যাবেই, সঙ্গে পাসপোর্ট, আই কার্ড এমনকি প্রাণটা অব্দি... মানে তুই বুঝতে পারছিস তো কেন অন্য জায়গার থেকে বেশি মাইনেটা দিচ্ছে?

গৌতম কথাগুলোর সঙ্গে লোকটার চোখের ইশারাগুলো বুঝে ঘাবড়ে গেছে। মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

- ওই দ্যাখ ভ্যান এসে গেছে। চল।

একটি কালো ভ্যান ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা লোক ভ্যান থেকে নেমে একটা কাগজ গৌতমের দিকে এগিয়ে দিল। রেজিস্ট্রি রুমে কাগজটা গৌতম পৌঁছে দিতেই ওখানে একজন অন্য একটি কাগজের সঙ্গে কী একটা মিলিয়ে ইঙ্গিত করল গাড়িটাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে। গৌতম নির্দেশানুসারে ফটক খুলে দিতেই ভ্যান সোজা ভেতরে ঢুকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। হ্যাঁ, অন্ধকারে। কারণ গৌতম এখনও বুঝে উঠতে পারেনি ফ্যাক্টরির ভেতরে আলোর প্রচুর

ব্যবস্থা থাকলেও বাইরে কোনো অজানা কারণে বিজলিবাতির কোনো ব্যবস্থা নেই। গার্ডদের সবার হাতেই পোর্টেবল লাইট। ভেতরে কে এল কে গেল বোঝার কোনো রাস্তাই নেই।

ভ্যান থেকে নেমে দুটো লোক ফ্যাক্টরির ভেতরে ঢুকে পড়ল। তাদের স্বাগত জানালেন একজন মধ্যবয়সি ভদ্রমহিলা। ফর্মাল পোশাকে আছেন তিনি। মুখে আলগা চটক নিয়ে কথা বললেন অভ্যাগতদের সঙ্গে। কুশল বিনিময়ের পর তাদের নিয়ে চললেন ফ্যাক্টরির ভেতরে। পেছনে পড়তে থাকল সারবদ্ধ অনেকগুলি ঘর এবং একটি বড়ো হলঘর। হলঘরে রাখা আছে বিশালাকৃতি কিছু মেশিন। মেশিনগুলো এখন বন্ধ। কিছু কর্মচারী মেশিনগুলোকে পরিষ্কার করছে। ভ্যান থেকে বেরিয়ে আসা লোকদুটো বারবার ঘুরেফিরে দেখছে মেশিনগুলোকে। এরকম জিনিস যে এরা আগে কখনও দেখেনি তা তাদের হাবভাবই বলে দিচ্ছে।

হলঘর পেরিয়ে একটি ছোট্ট প্যাসেজ। সেখানেই লোহার সিঁড়ি। একতলায় উঠেই ডানদিকের একটা ঘরে বসল সবাই। এটাই মিটিং রুম। সরবত চলে এল।

মহিলাই কথা বলা শুরু করলেন,

- একদম আনাড়ি, না কি তালিম দেওয়া আছে?

- যা পেমেন্ট হচ্ছে তাতে তালিম দেওয়া খুঁজতে গেলে সময় লাগবে আরও।

- আনাড়িগুলোকে পোষ মানাতে সময় লাগে।

- পয়সাও তো কম লাগে, ম্যাডাম।

বিশ্রী হাসির রোল ওঠে, যেন তিন হায়নার হাসি।

মহিলা বললেন,

- বেশ। নিয়ে এসো। কতজন আছে বললে?

- দু'জন।

একজন ইতোমধ্যে সরবত শেষ করে বেরিয়ে গেল এবং ভ্যান থেকে কালো কাপরে মুখ ঢাকা দু'জনকে নিয়ে হাজির হল। দু'জনেই মহিলা। কাপড়ের আড়াল থেকে বয়স আন্দাজের উপায় নেই।

ভদ্রমহিলা চেয়ার ছেড়ে উঠলেন এবং ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন নতুন কিনতে যাওয়া জিনিসের। মহিলা নয়, মেয়ে। বয়স কম। লোক দুটির সামনেই আলখাল্লার-ওপর দিয়ে হাত চালালেন মেয়ে দুটির পিঠে, পেটে, বুকে এবং নিতম্বে।

তারপর নিজের চেয়ারে এসে বসলেন,

- সব বিষয়েই আনাড়ি যে।

হাত কচলিয়ে হাসছে লোকদুটো।

বেলে চাপ দিতেই একটি ব্রিফকেস হাতে একজন চলে এল। ভদ্রমহিলা তার থেকে দুটো কেস বান্ডিল লোকদুটোর হাতে চালান দিয়ে বললেন,

- বাকিটা এদের টেস্ট হয়ে গেলে পর।

- টেস্ট করানো আছে। এই দেখুন রিপোর্ট। সিস্ট নেই।

ইশারায় রিপোর্ট লাগবে না জানালেন ভদ্রমহিলা।

- আমাদের টেস্ট শুধু ওভারিয়ান সিস্টের নয়, ওভারল হয়। ভয় নেই, সব নর্মাল হলে পেমেন্ট ওয়ান শটে পৌঁছে যাবে। আসতে হবে না।

লোকদুটো মহিলার সঙ্গে করমর্দন করে বেরিয়ে যায়।

ভদ্রমহিলা চেয়ার থেকে উঠে মেয়েদের মুখের কাপড় সরিয়ে নেন। তারপর আপাদমস্তক দেখে বললেন,

- তোমরা খুব ভাগ্যবতী। ভালো জায়গায় ভালো কোম্পানির হাতে পড়েছ। তবে এত সুখ কপালে আছে কি না দেখতে হবে। কাল কিছু পরীক্ষা হবে তোমাদের। আজ আরাম করো।

মেয়েদুটোর মনে কী চলছিল হয়তো একমাত্র ঈশ্বর জানেন। একজন লোক এসে হাতে হাতকড়া প্বরিয়ে তাদের নিয়ে গেল একতলার একদম শেষ হলঘরে। সত্যিই আজ এরা আরামেই থাকতে চলেছে।

হলঘরটিতে এসে মেয়ে দুটি যা দেখে তাতে তারা স্থির থাকতে পারে না। চারদিকে লোহার খাঁচার তৈরি, যেন কয়েদিদের সেল। প্রত্যেক সেলের ভেতরে গিজগিজ করছে তাদেরই মতো অনেকগুলো মেয়ে, মহিলা। প্রত্যেকের পরনে পোশাক একইরকম। এরকম পোশাক সাধারণত হাসপাতালে রোগীদের পরতে দেখা যায়। কিন্তু পোশাকগুলো ময়লা। হয়তো প্রতি সপ্তাহে বড়োজোর একবার পালটানো হয়।

ঘরটির মধ্যে এক অদ্ভুত গন্ধ। বমি পেয়ে যায় মেয়েদুটোর। একজন বমি করেই ফেলে। লোকটি তাকে জল এনে দেয় এবং একটি লোহার সেলের মধ্যে তাদের দু'জনকে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে যায়। তারা একটা জিনিস লক্ষ করে, পুরোনো কয়েদিদের কেউই তাদের

নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। সবাই এক-আধবার তাদের দেখে পাশ ফিরে শুয়ে থাকে, মেঝেতে।

আর একটা পার্থক্য তারা খুঁজে পায়। তারা যে সেলটায় আছে সেই সেলের সবাই কোনো না কোনোভাবে ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে, তবু তাদের শোবার জায়গা মেঝেতেই। অথচ এরকম কিছু সেল আছে যেগুলোতে শোয়ার ব্যবস্থা আছে, সেগুলিতে কিছু মেয়ে এবং মহিলা ঘুমোচ্ছে। ঘরটা এতই আলো-আঁধারি যে নতুন মেয়েদুটো ধরতেই পারে না কেন ওই মেয়েগুলোকে আপাতত শুইয়ে রাখা হয়েছে, কেনই বা সেখানে বেডের ব্যবস্থা। এরা জানে না আর একদিনের মধ্যেই যে নারকীয় কিছু ঘটনার সাক্ষী এদের থাকতে হবে, সে ঘটনা এখান থেকে মুক্তি পেলেও ভোলা কোনোদিন সম্ভব হবে না।

৩

তিয়াষের অফিসে একটি মিটিং চলছে। চিফ এডিটর ডেকেছেন আজকের মিটিং।

- সি, শুধু আমাদের রাজ্যে কেন, আমাদের দেশে অর মোর স্পেসিফিক্যালি এই পৃথিবীতে এরকম কোনো কোম্পানির কোনো ইতিহাস নেই। হ্যাঁ, একবার এক এনজিও ব্লাড ডোনেশানের মতো সদ্যোজাতদের জন্য ব্রেস্ট মিল্ক ডোনেশান শুরু করেছিল বটে, কিন্তু সেটা সেভাবে সাড়া ফেলতে পারেনি। কিন্তু আমাদের রাজ্যে যেটা হচ্ছে তাতে যে শুধু সদ্যোজাতদের মা-বাবা সাড়া দিয়েছেন এমন নয়, ডাক্তাররাও প্রেসক্রাইব করতে শুরু করেছেন। এমনকি পূর্ণবয়স্ক মানুষেরাও কিন্তু 'মা' ব্র্যান্ডের দুধ কিনছেন।

- স্যার, এটাকে হিপোক্রিসি ছাড়া আর কিছু বলবেন?

একজন সাংবাদিক প্রশ্নটি করে।

- দেখো, ব্যাবসাটা মরাল গ্রাউন্ডে হয় না। যেখানে ডাক্তাররা জানিয়েছেন যে এই দুধ চাইলে সবাই খেতে পারবে, খাদ্যমন্ত্রক থেকে সসম্মানে সাফল্যের সার্টিফিকেট পেয়েছে, সেখানে তোমার মরাল গ্রাউন্ড টিকবে না। আর এর থেকে বড়ো কথা, আমাদের কাজটা মরাল গ্রাউন্ড দেখা নয় আপাতত। 'মা' ব্র্যান্ডের কোনো মাথাকে সামনে এনে কোম্পানির এই অভূতপূর্ব সাফল্য নিয়ে আলোচনা করাই আমাদের

উদ্দেশ্য। এত অল্প সময়ে যখন মানুষের গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, এমনকি শেয়ার মার্কেটে আসার খবর রটছে তখন এই সাফল্যের টোটকা জানাই আমাদের কাজ।

- কিন্তু স্যার, শুনেছি 'মা' ব্র্যান্ডের ফ্যাক্টরিতে সাংবাদিক কেন, কোনো সাধারণ মানুষেরই প্রবেশাধিকার নেই।

তিয়াষ প্রশ্ন করে।

- যেখানে প্রবেশাধিকার নেই সেখানকার খবর জনসমক্ষে আনার জন্যেই না আমরা মাইনে পাই। তুমি ইন্টারেস্টেড আছ এই নিউজে? আমার ইচ্ছে ছিল অ্যাসাইনমেন্টটা তোমাকে দেব। বাকিরা সবাই তোমাকে প্রয়োজনে হেল্প করবে।

এভাবে সরাসরি এই কাজের অফার আসবে বস থেকে, এতটা আশা করেনি তিয়াষ। মুখে শুধু বলে,

- দায়িত্ব পেলে কাজটা অবশ্যই করব।

- বেশ, তবে কাজে লেগে পড়ো। প্রয়োজনে আমাদের এই মিটিং রুমের যে-কাউকে যে-কোনো সময় তুমি কাজে লাগাতে পারো, শুধু 'মা' ব্র্যান্ড সম্পর্কিত কাজে।

- ওকে, স্যার।

- শুধু মনে রেখো, এক্সক্লুসিভ নিউজ চাই এবং প্রয়োজনে ফুটেজও।

চোখে চোখ রেখে কথাটা বলেই বেরিয়ে গেলেন চিফ এডিটর সুনীল ভরদ্বাজ। বাকি সবাইও বেরিয়ে গেল একে একে। কিছুক্ষণ মিটিং রুমে একা বসে রইল তিয়াষ। পত্রিকা সম্পাদক কী নিউজ চাইছেন সেটা তিয়াষ বুঝে গেছে, কিন্তু সকালে বাবার বলা কথাগুলো খুব কানে বাজছে তার। সত্যিই তো, চাহিদামতো হিউম্যান ব্রেস্ট মিল্ক প্রতিদিন সরবরাহ করার জন্য ঠিক কতজন মানুষের, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে কতজন মেয়ের প্রয়োজন? কীভাবে সেই চাহিদা পূর্ণ করছে 'মা' ব্র্যান্ড?

নাহ্! ঘরে বসে এই উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। বাইরে বেরিয়ে খোঁজ করতে হবে। ওয়াশরুমের দিকে যায় তিয়াষ। আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নেয়। মুখে জল দেয়। অনেকদিন পর উত্তেজিত হচ্ছে তার শরীর। আর উত্তেজনা এলেই কীরকম একটা শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ব্রা'টাকে এক দাগ কমিয়ে একটু ঢিলে করে নেয় সে। তারপর হ্যান্ডব্যাগটা গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে।

বাইরে এসে একটা সিগারেট ধরায় । মোবাইলটা অনেকক্ষণ ধরেই হাতে ঘুরপাক খাচ্ছে। একটা নম্বর দেখা যাচ্ছে তাতে। কিন্তু তাতে ডায়াল করছে না তিয়াষ। শেষমেশ সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে ফোনটা করেই বসে। মাস কম নিয়ে পড়াকালীন তিয়াষের বয়ফ্রেন্ড, বর্তমানে তার রাইভাল সংবাদপত্রের একনিষ্ঠ সাংবাদিক জয় মুখার্জিকে ফোন করেছে তিয়াষ। রিং হয়ে যাচ্ছে।

- হ্যালো!

তিয়াষ চুপ। উত্তর দেয় না। এবার শোনা যায়,

- এতদিন পর?

এবার উত্তর দিতেই হয়,

- কিছু দরকারি কথা আছে। দেখা করা যায়?

- কখন?

- এখন?

- কিন্তু এখন তো আমি অফিসে......

- সি, ইটস আর্জেন্ট।

- হুম, কোথায়?

- অক্সফোর্ড?

- এসো। আমি আধ ঘণ্টায় আসছি।

জয় আগে পৌঁছয়। তিয়াষ মিনিট পাঁচেক পর। দু'জন দু'জনকে একবার দেখে নেয়। এতদিন পর একজন অপরজনকে দেখে কারও বুকের ধুকপুক আগের মতো বেড়েছে কি না সেটা মুখ দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই।

- কফি?

- ব্ল্যাক।

জয় কফি অর্ডার করে দেয়।

- এবার বলো।

- সি, সরাসরি কথায় আসছি।

- আমিও সেটাই চাই।

- গুড। নতুন একটা অ্যাসাইনমেন্ট পেলাম। তোমার হেল্প চাই।

- বাহ্! কলেজের অভ্যেস এখনও আছে দেখে ভালো লাগল।

- এটা প্রফেশানাল ডিলিংস হবে।

- বেশ। খুলে বলো।

- 'মা' ব্র্যান্ড।

জয় এবার সোজা হয়ে বসে।

- আমাকে আজকে অফিশিয়ালি 'মা' ব্র্যান্ডের সমস্ত কিছু স্টিং করতে বলা হয়েছে। তুমি আমাকে এই কাজে সাহায্য করতে পার। সকালে পড়লাম তোমাদের পত্রিকা নিউজ করেছে বিষয়টা নিয়ে। পড়ে মনে হল তোমারই লেখা। দু'জন একসঙ্গে কাজ করি চলো, আলাদা আলাদা এক্সক্লুসিভ ভাগ করে নেব।

- আমাকে একটু ভাবতে দেবে?

- না। ইয়েস অর নো, এই টেবিলেই।

- এটা কলেজের ব্রেক-আপ নয়।

- প্লিজ বি প্রফেশনাল।

- ওকে, ডান। তবে এই বিষয়ে আমি আর তুমি ছাড়া আর কেউ ইনভলভ হবে না।

- তোমার কোনো গোপন কাজ আমি এখনও ফাঁস করিনি, আর এটা তো আমার নিজের প্রস্তাব। নিশ্চিন্তে থাকো। আমি অফিস টিমের কারও হেল্প নেব না।

- প্রফেশনাল যখন বলেছ, কলেজ-লাইফের কোনোকিছু নিয়ে কথা শোনানো যাবে না। প্লিজ, আই অ্যাম গেটিং এম্ব্যারাস্‌ড।

- সরি। তুমি কতদূর কী ইনভেস্টিগেট করেছ বলো।

- যা করেছি তা আজ কাগজে লিখেই দিয়েছি। ওই... ইন জেনারেল মার্কেট সার্ভে। তার ওপর ভিত্তি করেই সাফল্যের ইতিহাস লেখা।

- আর কিছু?

- হুম। ওদের দুধের প্যাকেটে যে ঠিকানা লেখা থাকে সেখানে গেছিলাম।

- তারপর?

- ওটা একটা ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্ট কাম স্টোরেজ বলতে পারো। ফ্যাক্টরি সেখানে নেই।

- হোয়াট? তাহলে আমরা এখানে কী করছি? চলো ওখানে।

- কিন্তু কেন? এত ইম্পর্ট্যান্ট কেন ওই ফ্যাক্টরি?

জয় একথা বলার ফাঁকেই তিয়াষা উঠে পড়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলে, "গাড়িতে উঠে বলছি।"

ঠিকানা দেখে ক্যাব ডেকে নেয় তারা।

উত্তর কলকাতার পাতিপুকুর সংলগ্ন একটি এলাকায় যখন গাড়ি

এসে দাঁড়ায় ততক্ষণে তিয়াষা জয়কে তার চিন্তার সমস্ত কিছু বলে ফেলেছে। জয় শুধু একটা কথাই বলেছে,

- আরে শালা, এত কিছু তো ভাবিইনি। যদি উদ্‌ঘাটন করতে পারি, বিশাল বড়ো ব্রেক হতে চলেছে আমাদের।

- ভুল, আমার আর তোমার। আলাদাভাবে, কেমন!

জয় আর কথা বাড়ায় না। এ মেয়ের সঙ্গে কথা বাড়িয়ে যে লাভ নেই জয় অনেক বছর আগেই বুঝতে পেরেছিল।

স্টোরেজটি মেইন রাস্তা থেকে একটু ভেতরে। ট্যাক্সি থেকে ইচ্ছে করেই কিছুটা আগে নেমে যায় তারা এবং হাঁটতে থাকে।

- তুমি যেয়ো না। আমি একা যাব।

- কেন?

- কারণ তুমি অলরেডি একবার জিজ্ঞেস করে এসেছ। বারবার গেলে সন্দেহ হবে।

- একা যাবে?

- চুরি করতে যাচ্ছি না। আর ডোন্ট শো দিজ কাইন্ডা কেয়ার ফর মি, প্লিজ।

- ওক্কে। ফাইন।

জয়কে পেছনে রেখে এগিয়ে যায় তিয়াষ। স্টোরেজের মুখে একজন গার্ড আছে। তার সামনে যেতেই গার্ড জিজ্ঞেস করে,

- কী দরকার? কার সঙ্গে দেখা করবেন?

- ডিস্ট্রিবিউটারশিপ নেব। সে ব্যাপারে কথা ছিল।

- খাতায় নাম-নম্বর লিখুন।

তিয়াষ লিখে দেয়।

- এখানে বসুন। ডাকছি।

তিয়াষ সামনের একটি চেয়ারে বসে। মিনিট দুই পড়েই ভেতরে ডাক আসে। ভেতরে গিয়ে তিয়াষ দেখে একজন সাধারণ ম্যানেজার গোছের মধ্যবয়সি লোক বসে আছে টেবিলের ওদিকে।

- বসুন, হ্যাঁ বলুন।

তিয়াষ বসতে বসতেই উত্তর দেয়,

- আমার নাম খুশি দাস। আমাদের পাড়ায় একটা দোকান আছে। খুব বড়ো নয় তবে মাঝারি ব্যাবসা। 'মা' ব্র্যান্ড কলকাতায় খুব চলছে। তাই ডিস্ট্রিবিউশন চাইছিলাম।

- আপনি কোথায় থাকেন? মানে দোকান কোথায়?

- নৈহাটি।

- হ্যাঁ, ওদিকটায় আমরা এখনও পৌঁছতে পারিনি। আগামী সপ্তাহে আমরা নতুন ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে একটা মিটিং করব। কোথায় কোথায় নতুন ডিস্ট্রিবিউশন আমরা করব সেই বিষয়ে কথা হবে। আপনাকে আমাদের এখান থেকে জানানো হবে। আপনি মিটিংটা অ্যাটেন্ড করুন।

- আচ্ছা, কোথায় হবে মিটিং?

- আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে। নম্বর তো লিখেই দিয়েছেন।

- আচ্ছা। আর একটা কথা।

- বলুন।

- আপনাদের ফ্যাক্টরি কি এখানেই?

এবার লোকটার চোখ ছোটো হয়। সামলে নিয়ে বলে,

- না, এখানে নয়। অন্য জায়গায়। এবার আপনি আসুন। আপনাকে সময়মতো জানানো হবে।

তিয়াষ বেরিয়ে গেলে ম্যানেজার লোকটা মোবাইলে একটা নম্বর ডায়াল করে।

- মেয়েটির ওপর লক্ষ রাখো। ফ্যাক্টরির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছিল। নাম, নম্বর, ঠিকানা ক্রসচেক করো।

মেইন রাস্তায় উঠেই জয়কে দেখতে পায় তিয়াষ। জয় সামনে এসেই কী হল জানতে চায়। অল্প কথায় ঘটনা বুঝিয়ে তিয়াষ বলে,

- ওয়েট করতে হবে এখানে।

- বুঝেছি। কিন্তু ওয়েট করে লাভ হবে কি? স্টোরেজ খালি ছিল, না কি ভরতি?

- ভরতি ছিল। কিন্তু চান্স তো নিতেই হবে। তবে একটা ভুল করে ফেলেছি।

- কী ভুল?

- সরাসরি ফ্যাক্টরির কথা জিজ্ঞেস করাটা উচিত হয়নি আমার। এ প্রশ্ন দিয়ে ডিসট্রিবিউটারের কাজ কী?

- বেফাঁস কথা বলার নামই তিয়াষ। আচ্ছা তবে তো রাত অব্দি অপেক্ষা। এখন কিছু খেয়ে ফেলা যাক।

- একটা গাড়ির দরকার। ব্যবস্থা করতে পারবে?

- হুম, দেখছি।

সন্ধে প্রায় হয়ে এসেছিল। হাতে অনেকটা সময়। স্টোরেজের আশেপাশেই থেকেই কাটিয়ে দেয় তারা। নতুন তথ্য বলতে কবে থেকে এই স্টোরেজে এখানে আছে, কারা এখানে চাকরি করে ইত্যাদি। এই তথ্যগুলি যে কোনো কাজেই লাগবে না সেটা দু'জনেই বুঝে যায়। ইতোমধ্যে জয় একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে ফেলে। সারারাত স্টোরেজের অনতিদূরে এই গাড়িতেই ঘাঁটি গাড়বে বলে ঠিক করে জয় এবং তিয়াষা। জয় আন্দাজমতো একটি জায়গায় গাড়িটি পার্ক করে।

- এখান থেকে স্টোরেজ এবং সামনের রাস্তার পরিষ্কার ভিউ পাওয়া যাচ্ছে। কোনো গাড়ি এলে বা বেরোলে এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাবে।

তিয়াষ চুপচাপ মোবাইলে কিছু মেইল করতে থাকে। বাড়িতে কথা বলে বাবাকে জানায়। বসকে রাতের প্ল্যানের কিছুটা জানিয়ে রাখে যদি কোনো গন্ডগোলে পড়তে হয় যেন ব্যাকআপ রেডি থাকে। জয়ের ব্যাপারে কিছুই সে জানায় না। রাত বাড়তে থাকে। স্টোরেজ থেকে বেশ কিছু গাড়ি বেরিয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু মালবোঝাই কোনো গাড়ি এখনও এসে ঢোকেনি। যে গাড়িগুলো বেরোচ্ছে, জয় ও তিয়াষ ধরে নেয় যে সেগুলি শহরতলির ডিস্ট্রিবিউশনের গাড়ি। লোকবল বেশি থাকলে হয়তো সেগুলোর পেছনেও লোক পাঠানো যেত, কিন্তু এই মুহূর্তে সে উপায় নেই।

মাঝে মাঝে তিয়াষের সঙ্গে দেখা হওয়া ম্যানেজারটিকে দেখা যাচ্ছে বাইরে এসে সিগারেট খাচ্ছে। প্রতি আধ ঘণ্টায় একবার সে বাইরে আসছে।

তিয়াষ সেটা দেখে বলে,

- আজকে মালবোঝাই গাড়ি আসবেই। নইলে লোকটা বারবার বাইরে যাওয়া-আসা করত না।

- দেখা যাক। যদি না'ও আসে, তোমার সঙ্গে এতদিন পর আবার একটা রাত কাটিয়েছি ভেবেই না হয় মনকে সান্ত্বনা দেব!

- ওই তো গাড়ি আসছে একটা।

তিয়াষ কথাটা বলেই প্রায় লাফিয়ে ওঠে। তিনটে ছ'চাকার মালবোঝাই পাঞ্জাব বডি আসছে স্টোরেজের দিকে। রাত এখন একটা। গাড়িগুলো এসে দাঁড়ায় এবং লোকজন এসে গাড়ি খালি করতে থাকে। ওদিকে তিয়াষারা অপেক্ষায়। এ অপেক্ষার প্রহর যেন

শেষ হওয়ার নয়। রাত দুটো গড়িয়ে তিনটে পার করে। জয়ের তন্দ্রা এসে পড়েছে যখন, ঠিক তখন তিয়াষা জোরে ধাক্কা দেয়।

- গাড়ি তুমি চালাবে, না আমি বসব ড্রাইভিং সিটে?

জয় গাড়ি স্টার্ট দেয়। কলকাতার বুকে ভোররাতে তিনটি পাঞ্জাব বডির পেছনে একটি হিউন্ডাই ক্রেটা ছুটতে থাকে। গাড়িগুলো এয়ারপোর্টের রাস্তা ধরে এবং সেদিক দিকে বেরিয়ে রাজারহাটের দিকে ঘুরে যায়। হাইওয়ে দিয়ে ছুটছে চারটি গাড়ি। চারদিকে জনমানবশূন্য মাঠ ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কিছু অর্ধসমাপ্ত হাইরাইজ বিল্ডিং ছাড়া এই ইঁদুর-বেড়াল দ্বৈরথ দেখার লোকের খুব অভাব।

- দূরত্বটা বেশি বেড়ে গেছে। আর একটু কমিয়ে দাও। ওরা এগিয়ে যাচ্ছে।

- বেশি কাছাকাছি থাকলেও মুশকিল।

জয় তিয়াষকে বোঝানোর চেষ্টার মাঝেই গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনে বাম্প খেয়ে কী যেন একটা চলে যায়। জিনিসটা এতটাই ওজনদার ছিল যে কাচ পুরো ফেটে যায় এবং জয় টাল সামলাতে পারে না। গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা নেমে যায় বাঁ দিকের একটি মাঠে। দুটো পালটি খেয়ে গাড়ি একদিক হেলে পড়ে থাকে মাঠেই।

তিয়াষ ধীরে ধীরে চোখ খোলে। সময়ের ঠাহর সে করতে পারে না। গায়ে বেশ কিছু জায়গায় ব্যথা অনুভব করছে সে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সামনে সাদা একটি বেলুন ছাড়া। বুঝতে পারে বেলুনটা আসলে এয়ারব্যাগ। মানে সে এখনও গাড়িতেই আছে। কিন্তু জয় কোথায়?

কোনোমতে গাড়ি থেকে বের হয় তিয়াষ। গায়ে অসহ্য ব্যথা করছে। সেই নিয়েই অন্ধকারে হাতড়ে গাড়ির অন্য দরজাটার দিকে পৌঁছয় সে। জয় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। দরজা খুলে তাকে বের করার চেষ্টা করে তিয়াষ। কিন্তু হাতে একদম জোর পাচ্ছে না।

- আরে ম্যাডাম, আপনি কষ্ট কেন করছেন? আমরা আছি তো। স্যারকে ঠিক হাসপাতালে পৌঁছে দেব।

গলাটা কার? খুব চেনা চেনা ঠেকছে। তিয়াষ মাটিতে বসেই ঘুরে তাকায়। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। লোকটা বোধহয় এবার একদম কাছে এসে বসেছে তার পাশে,

- সন্ধেবেলায় ভাগ্যিস ফ্যাক্টরির কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, নয়তো বুঝতেই পারতাম না আপনি ঠিক কীরকম ডিস্ট্রিবিউশনশিপ নিতে চাইছেন।

কথাটা শেষ করেই একটা পাওয়ারফুল টর্চের আলো ফেলে সে তিয়াষের মুখে। তিয়াষ সহ্য করতে পারে না সে আলো। মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ততক্ষণে সে চিনে গেছে সামনের লোকটাকে।

- চলুন ম্যাডাম খুশি, সরি সরি, ম্যাডাম তিয়াষ ব্যানার্জি। আপনাকে পেয়ে আমাদের কোম্পানি খুবই আনন্দিত হবে।

তিয়াষের গায়ে আর জোর নেই। প্রায় মাটিতে শুয়েই পড়েছে সে। কোনোমতে শুধু একটা কথাই বলতে পারল,

- তোমরা জয়কে কিচ্ছু কোরো না প্লিজ, ওকে তোমরা ছেড়ে দিয়ো।

জ্ঞান হারায় তিয়াষ।

৪

পরদিন সন্ধেবেলায় তিয়াষের জ্ঞান ফিরল। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল সে। কিন্তু ঘরটা এতই আলো-আঁধারি যে কিছু ঠাহর করে উঠতে পারল না সে। উঠে বসার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝল কোমরে খুব ব্যথা। সাহায্য ছাড়া উঠতে পারবে না। আর তখনই একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করল সে। এতক্ষণে চোখ এই আলো-আঁধারিতে সয়ে গেছে। তারই বয়সি একটি মেয়েকে দেখতে পেল সে। মেয়েটার সাহায্যে উঠে বসল সে।

- কোথায় আছি আমি?

- আমরাও জানি না। গতকাল রাতেই এনেছে আমাদের।

- এনেছে মানে?

- মানে বিক্রি করেছে।

- হোয়াট? কে বিক্রি করেছে? আমিই বা এখানে এলাম কীভাবে?

- কে বিক্রি করেছে আমরা জানি না। তোমাকে দেখলাম আজ ভোরবেলায় এনে এই সেলে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল।

এবার দ্বিতীয় মেয়েটা উত্তর দিল।

তিয়াষের এবার একটা কথা মনে পড়তেই সে জিজ্ঞেস করল,

- আচ্ছা আমার সঙ্গে কোনো ছেলেকে এরা এনেছিল?

- তা তো জানি না। এই জায়গাটায় বাইরের কোনো ছেলেকে আমরা কাল থেকে দেখিনি। এখানের কিছু লোক আছে, সবই ব্যাটাছেলে। ওরাই সব করে দেখলাম। আর হ্যাঁ, একজন মহিলাও আছেন।

- মহিলা?

- হ্যাঁ, যিনি আমাদের পয়সা দিয়ে কিনলেন। আজ সকাল থেকে একগাদা টেস্ট করালেন।

- কীসের টেস্ট?

- কিছুই জানি না। ইউএসজি করালেন, আরও কীসব।

তিয়াষ আর কথা বলে না। চারদিক খুঁটিয়ে দেখতে থাকে সে। এতক্ষণে সে বুঝে গেছে কোনো এক চক্রের ফাঁদে সে পড়েছে। এবার বাকিটা বুঝে নিতে হবে তাকে। ভালো করে লক্ষ করতে থাকে সে চারপাশ। একটি বন্ধ হল ঘর, তার ভেতরে অনেকগুলো লোহার সেল। প্রত্যেকটার ভেতর গোটা তিরিশ-চল্লিশজন মেয়ে এবং মহিলা। সবার বয়সই কুড়ি থেকে চল্লিশের মধ্যে। অন্তত দেখে এর বেশি কাউকে মনে হয়নি। সেলগুলো আবার দু'ভাগে বিভক্ত। একদিকের সেলে সবাই মেঝেতে শুয়ে আছে এবং অপরদিকের সেলের সবাই হয় গদিতে, নয় বিছানায়। আর একটু ভালো করে দেখলেই বোঝা যায় ওদিকের সেলের যারা গদি বা বিছানায় শুয়ে আছে, তারা প্রত্যেকেই প্রেগন্যান্ট। গদিতে যারা আছে, তাদের প্রেগন্যান্সির আর্লি পিরিয়ড। অ্যাডভান্স স্টেজের সবাই বিছানায়। খালি চোখে দেখে এটুকুই বুঝতে পারল তিয়াষ। আর একটা ছোটো সেল আছে, সেটা আপাতত খালি। তিয়াষ বুঝতে পারে এত এত প্রশ্ন জমা হয়েছে তার মনে। কিন্তু তার কূলকিনারা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। সময় চাই। আর একটু ঘুম চাই।

রাতে একটা গোঙানির শব্দে ঘুম ভাঙল তিয়াষের। উঠেই দেখল সন্ধেবেলায় কথা বলা মেয়েদুটোও চোখে ভয় নিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে সামনের একটি সেলে। এই প্রথম হলঘরের অন্যান্য সব মেয়ে-মহিলাদের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। বীভৎস সেই শব্দ, বীভৎস সব আর্তনাদ। কেউ ধীরে ধীরে জোকার দিচ্ছে, কেউ ফোঁপাচ্ছে, কেউ বিচ্ছিরি চটক কাটছে মুখে। কিন্তু কেউ কোনো উৎপাত করছে না। সবাই যে যা করছে নিজ নিজ জায়গায় করছে। তিয়াষ বুঝতে পারে ঘরের সবাই ভীষণরকম ডিপ্রেশনে চলে গেছে, যেখান থেকে এদের ফেরানো কঠিন। কী পরিমাণ মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার রেগুলার রুটিনে থাকলে কেউ প্রতিবাদটাও স্থাণুবৎ হয়ে করে ভেবেই কেঁপে ওঠে সে। এবার কি তার পালা?

ভাবার অবকাশ পায় না সে। গোঙানি বাড়তে থাকে। মহিলার নিশ্চয়ই ওয়াটার ব্যাগ ভেঙে গেছে, এ গোঙানি প্রসববেদনার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনজন কর্মচারী এবং একজন মহিলা ডাক্তার এলেন। মহিলাকে সেল থেকে প্রায় টেনে বের করলেন এবং যে ছোটো সেল খালি ছিল সেই সেলের বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিলেন। তিয়াষ শুধু একটা ব্যাপার বুঝল না। প্রসববেদনা ওঠা মায়ের ডেলিভারি টেবিলে যেতে এত অনীহা কেন?

এতগুলো সেলের বন্দিদের সামনেই শুরু হল ডেলিভারি। সিজারিয়ান নয়, ডেলিভারি হবে নর্মাল পদ্ধতিতে। এতক্ষণ সেলের সব বন্দি যে বীভৎস শব্দ করছিল তা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। সবাই যেন শ্বাস আটকে কোনো ফলাফলের আশা করছে। এখন হলঘরময় শুধু একটা শব্দেরই অনুরণন, প্রসববেদনায় কাতর এক মায়ের চিৎকার। তিয়াষ সহ গোটা হলঘরের জোড়া জোড়া চোখ এখন ওই ছোট্ট হলঘরে।

একজন পুরুষ মহিলার দুটো হাত ধরে আছে, নিচে দু'জন মহিলার দুই উরু। মহিলা প্রাণপণ প্রেশার দিয়ে চলেছেন। ডাক্তার মহিলা মহিলার যোনিদ্বারে বাচ্চাটির মাথা বেরোনো মাত্র সাকশান পাইপ দিয়ে টানছেন। মিনিট পাঁচেকের সংঘর্ষের পর বাচ্চাটি রক্তাক্ত দেহে বেরিয়ে এল। এরপরের ঘটনার বিবরণ লিখতে গেলেও শিউরে উঠতে হয়।

আলোর সামনে ধরা হল বাচ্চাটিকে। পুত্রসন্তান। হলঘরে উপস্থিত সবাই দেখতে পেল বাচ্চাটির পুত্রসন্তান হওয়ার প্রমাণ। যেন সবাইকে দেখানোর জন্যেই এভাবে আলোর সামনে সবাইকে দেখানো। তিয়াষ এবার লক্ষ করল, প্রত্যেকটা সেলের প্রত্যেকটা মানুষ যে যেখানে ছিল এসে জড়ো হয়েছে সেলের লোহার রডের ধারে। সবাই চিৎকার করছে। ভাষা বোঝা যাচ্ছে না উত্তেজনায় কিন্তু সবার হাত সেলের বাইরে বেরিয়ে আছে। প্রত্যেকেই বাচ্চাটির সান্নিধ্য পেতে চায়, অন্তত একটিবার বাচ্চাটিকে ছুঁয়ে দেখতে চায়।

চিৎকার থামিয়ে হলঘর কাঁপিয়ে একটি মহিলা কণ্ঠ ভেসে আসে ছোট্ট সেল থেকে। ডাক্তার মহিলা বলছেন,

- পুত্রসন্তান নয়, আমাদের শুধু কন্যাসন্তান চাই।

হাতে ইশারায় যার হাতে বাচ্চাটা ছিল তাকে কিছু একটা বলে

বেরিয়ে গেলেন তিনি। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনে রাখা একটা গরম জলের ড্রামে বাচ্চাটাকে উলটো করে ডুবিয়ে দিল লোকটা। এক... দুই... তিন সেকেন্ড। হাতটা ওপরে চলে এল, বাচ্চাটা আর তাতে ধরা নেই।

হলঘর এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল না। তাদের আর শক্তি নেই, শ্মশানের নীরবতা গ্রাস করল অন্ধকার হলঘরটিকে। বাচ্চাটির মা এখনও অচৈতন্য।

বাচ্চাটাকে একবারের জন্যেও দেখেনি সে।

৫

গতকাল রাতের ঘটনার পর সারারাত ঘুমোতে পারেনি তিয়াষ। নতুন দুটো মেয়ের অবস্থাও তার মতোই। তুলনায় কিছুটা স্বাভাবিক পুরোনো কয়েদিরা। হয়তো এটা এখানকার আকছারের ঘটনা বলেই। এদিকে সকাল থেকেই আজ তিয়াষের অনেকগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। তিয়াষ এটা বুঝে গেছে যে, এখানে তাদের কথাতেই চলতে হবে, নইলে যা খুশি হতে পারে। কোনো কিছুতেই সে আজ বাধা দেয়নি। তার চরিত্রের বিপরীতে গিয়ে সে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টাই করে গেছে। আজ শুধু তার দেখে যাওয়ার দিন।

সকালবেলায় তিয়াষকে এসে নিয়ে যায় একজন ষন্ডামার্কা লোক। তিয়াষ বিনা বাক্যব্যয়ে তার সঙ্গে গেল। এই ফ্যাক্টরির তেতলার একপ্রান্তে একটা প্যাথলজি আছে। সেখানেই নিয়ে যাওয়া হল তিয়াষকে। তিয়াষ সেখানে যাবার পথে দেখল প্রতি ফ্লোরেই রয়েছে বিশালাকার অনেক মেশিন। প্রতি ফ্লোরেরই শেষ কোনায় রয়েছে লোহার চেম্বার সেল। তার মানে শুধু সে যেখানে রয়েছে সেখানকার কয়েকশো মহিলা নয়, শহর জুড়ে দুধের বিক্রির জন্য কয়েক হাজার মহিলাকে দিনে দিনে কয়েদ করা হয়েছে এই ফ্যাক্টরিতে। এত এত মহিলার বুকের নির্যাস ছিবড়ে করে আগামীতে বাজারে আসতে চলেছে ব্র্যান্ড 'মা'-এর শেয়ার স্টক।

এসব দেখতে ও ভাবতে ভাবতেই তিয়াষ গিয়ে পৌঁছয় প্যাথলজিতে। রক্তপরীক্ষার জন্য বেশ কিছু আলাদা আলাদা স্যাম্পল কালেক্ট করা হয়, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করা হয়। তারপর আবার সেই ষন্ডামার্কা লোকটাই তাকে তার সেলে পৌঁছে দেয়। যাবার আগে বলে যায়,

- খাওয়া-দাওয়া জলদি সেরে নে তোরা তিনজন। তোদের ক্লাস আছে আজ। ম্যাডাম ক্লাস নেবেন।

লোকটা চলে যায়। তিয়াষ এবং গতরাতের নতুন মেয়েদুটিকে আঙুলের ইশারায় তৈরি থাকতে বলে সে।

তিয়াষ একটা জিনিস লক্ষ করেছে। এখানে বন্দিদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার, অকথ্য অত্যাচার করা হলেও খাবার-দাবার ভালো দেওয়া হয়। ভালো খাবার না খেলে মহিলারা ভালোমানের দুধ উৎপাদন করতে পারবে না ভেবেই হয়তো এদিকে কোম্পানি বিশেষ নজর দিয়েছে।

সবাইকেই সকালে খাবারের সঙ্গে দুধ দেওয়া হয়। আর এ দুধ মানুষের নয়, গোরুর।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে দু'জন লোক সেলের কাছে এসে তিয়াষদের নাম ধরে ডাকে। তিনজন বেরিয়ে এলে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় সিক্সথ ফ্লোরে। এবারের যাতায়াত সিঁড়ি দিয়ে নয়, লিফটে। তাই ফোর্থ বা ফিফথ ফ্লোরে কী হয়, তা দেখার সুযোগ পায় না তিয়াষ। অথচ তার মন চাইছে পুরো ফ্যাক্টরি ইউনিটটা দেখতে।

সিক্সথ ফ্লোরে পৌঁছে একটি নির্দিষ্ট ঘরে আসে তারা। বাইরে থেকে অনুমতি নিয়ে লোকদুটো তিয়াষ ও বাকি দু'জনকে ভেতরে পাঠিয়ে দেয়।

তিয়াষ ভেতরে ঢুকে দেখতে পায় গতকাল রাতে ডেলিভারি করতে আসা মহিলাকে, যার ইশারায় বাচ্চাটিকে গরম জলে চুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঘটনাটা মনে হতেই মহিলার প্রতি বিদ্বেষে মুখ বেঁকে যায় তিয়াষের।

- ওয়েলকাম মাই চিলড্রেন। প্লিজ সিট।

মহিলা হাসিমুখে আদেশ করতেই বসতে বাধ্য হয় বাকি দু'জন, দেখাদেখি তিয়াষও বসে পড়ে।

- আমি জানি তোমাদের মনে অনেক প্রশ্ন, অনেক ভয়। সেইসব কাটাতেই আজ ডাকলাম তোমাদের। আমি মিস বাসু, আর আমিই প্রকৃত অর্থে এই ইন্ডাস্ট্রি।

কথাটা বিদ্যুতের মতো সারা শরীরে ছুটে চলে তিয়াষের। ইনিই তিনি, যিনি এই 'মা' ব্র্যান্ড চালাচ্ছেন।

- আপনি-ই?

তিয়াষ আঙুল তুলে প্রশ্ন করে।

- হ্যাঁ, আমি। একজন মহিলা, ভারতে প্রথম এরকম একটা বিষয়কে ইন্ডাস্ট্রির চেহারা দিয়েছি।

- একজন মেয়ে হয়ে, এতগুলো মেয়ের...

তিয়াষকে মাঝপথে থামিয়ে মিস বাসু বলেন,

- ওহ্ স্টপ দিজ কাইন্ডা জোকস! মানুষ এন্টিটিটাই একা, কেউ কারও জন্যে নয়। সেখানে পুরুষ-মহিলা ভাবাটাই বৃথা। এই যে আমি ডাক্তার ছিলাম, আগের জীবনে হন্যে হয়ে সব পুরুষ সার্জেনকে অ্যাসিস্ট করেছি কী পেয়েছি? স্রেফ টাকা পেয়েছি। কিন্তু নাম তো হয়েছে সেই ডাক্তারদেরই। আর এই যে আজ এই ফ্যাক্টরিতে শ'পাঁচেক পুরুষ আমার জন্য কথায় উঠছে-বসছে, সেটাও শুধু টাকার জন্যেই। মেইল-ফিমেইল ব্যাপারটাই বোগাস। একজন সাংবাদিক হয়েও যদি তুমি না বোঝো তবে আর কে বুঝবে বলো?

বলে হাসলেন মিস বাসু। তিয়াষ লক্ষ করল মহিলার বয়স হলেও এখনও একটা আলগা চটক রয়েছে মহিলার কথোপকথনের ভঙ্গিতে, হাসিতে চলকে পড়াতে।

- কিন্তু এক্ষেত্রেও তো নাম পাচ্ছেন না? বাইরে দুনিয়ায় 'মা' ব্র্যান্ডের সবটাই ধোঁয়াশা। আপনিই যে ইন্ডাস্ট্রি সেটা কে জানে?

মহিলার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য, আবার ফিরে এল,

- প্রোটোকল বাবু, প্রোটোকল। এ ব্যাবসা তো আর আলু-পটলের নয়, খোদ মাতৃদুগ্ধের। তাই এখনও আসেনি নাম। একদিন আসবে।

তিয়াষ বুঝতে পারে না এহেন একজন ক্ষমতাবান মহিলাকে এই মুহূর্তে আর তার কী বলা উচিত। মিস বাসু নিজেই কথা বললেন,

- দেখো, তোমরা এক মহৎ কাজের অংশ হতে চলেছ। দেশবাসীর স্বাস্থ্য তোমাদের হাতে দিতে চলেছি আমরা। বাচ্চাদের প্রথম অমৃত দেবে তোমরাই। এর থেকে ভালো কাজ আর কী'ই বা হতে পারে? তোমাদের খাওয়া-দাওয়া, ভরণপোষণের সব দায়িত্ব আমার। তোমরা মানসিকভাবে তৈরি করো নিজেকে।

খুব শান্তভাবে, ধীর লয়ে কথা বলে শেষ করলেন মিস বাসু।

এই ব্রেইনওয়াশ পদ্ধতিতে বাকি দু'জনের ওপর কী প্রভাব হল বোঝা গেল না। কিন্তু তিয়াষ মুচকি হাসল।

- মিস বাসু, বোকা ভেবেছেন না আমাদের? বেশ ধরে নিলাম,

খুব মহৎ কাজ করতে চলেছি আমরা। তা সেই মহৎ কাজ বেঁচে তো আপনি পয়সা কামাচ্ছেন। আমরা যারা এই ফ্যাক্টরিতে নিজের বুকের দুধ সাপ্লাই করব, তাদের বেতন কই? শুধুমাত্র ভালো খাবার আর এক সপ্তাহ অন্তর ময়লা পোশাক-আশাক দিয়ে এতগুলো মানুষে স্বাভাবিক জীবন কেড়ে নিয়ে মহৎ কাজ দেখাচ্ছেন আমাদের! মহৎ কাজ যদি করতেই হয় করুন না, দেশের বড়ো বড়ো মিল্ক প্রোডিউসারের মতো ওয়েজ সিস্টেমে করুন। স্বেচ্ছায় তারা এসে দুধ দিয়ে পয়সা নিয়ে যাবে। নারী পাচারকারীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কীসের মহৎ কাজ?

এতক্ষণে যেন কথাগুলো বলে শান্তি পেল তিয়াষ।

- হুম। তবে আমার খাঁচায় চিৎকার করার মতো একটা বাজ ঢুকে পড়েছে। ভালো, ভালো! তবে শোনো, আর ব্রেইনওয়াশ নয়। সরাসরি বলছি, যা আমি বলব তা'ই তোমাদের করতে হবে। হুকুম তামিলের বাইরে কিচ্ছু নেই আমার দুনিয়ায়।

শব্দ করে হাসে তিয়াষ,

- বেরিয়ে গেল আপনার মহৎ কাজের ফানুস?

মিস বাসুর মুখটা লাল হয়ে উঠে,

- তিয়াষ, তুমি হয়তো জানো না ডাক্তাররা পর্যন্ত আমার কোম্পানির দুধ প্রেসক্রাইব করছেন। সমস্ত বয়সের লোকেদের জন্য।

- আবার হাসালেন আপনি। কিছু অসাধু ডাক্তারকে শুধু পয়সা ফেলে কেনা যায় এসব প্রেসক্রাইব করানোর জন্য। আপনিও জানেন ছোটো ছোটো দুধের শিশু ছাড়া এই দুধ বড়োদের পুষ্টিবিধান করতে পারবে না। শুধুমাত্র ব্যাবসা একটা হিউজ স্কেলে বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই স্টেপ নিয়েছেন আপনি। আর শহরের কিছু হিপোক্রিট খরিদ্দার এই ব্যাবসা বাড়াতে আপনাকে সাহায্য করছে। আমি আপনার মতো ডাক্তার না হতে পারি মিস বাসু, কিন্তু আমিও জানি যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড, অ্যান্টিবডি, হরমোন, এনজাইম এবং ভিটামিন-মিনারেলসের সমন্বয় এই ব্রেস্ট মিল্ক, তা শুধুমাত্র বাচ্চাদের জন্য অমৃত। মহৎ কাজই যখন করবেন তখন বড়োদের কাছে কেন বিক্রি করছেন এই দুধ?

কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে যায়। মিস বাসু হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে তিয়াষ বেশ পড়াশোনা করেই এই কাজে নেমেছে। তিনি বললেন,

- একটা সেফটি কী জানো, তুমি আর বাইরের দুনিয়া দেখতে

পারবে না। তাই তোমাকে অনেক কথাই বলা যাচ্ছে। তুমি যা বলেছ তা সত্যি। এ দুধে বড়োদের জন্যে কিচ্ছু নেই। আমরাই অ্যাডেড অনেক কেমিক্যাল দিয়ে বড়োদের উপযোগী করি এই দুধ, যার উল্লেখ প্যাকেটে পাবে না। তবু বিক্রি হচ্ছে, কারণ এ শহর হুজুগে মাততে ভালোবাসে। আমিও টু পাইস কামিয়ে নিচ্ছি। পয়সার আর বুদ্ধির জোর না থাকলে যে এরকম একটা ব্যাবসা এক মহিলা চালাতে পারবেন না আশা করি তুমি সেটা বোঝো। যে জিনিসের ব্যাবসা করছি, তার জন্যে পুলিশ, মন্ত্রী সবাইকেই পকেটে রেখে কাজ করতে হয়। তাই এ ব্যাবসা তো চলবে। আর বাকি রইল ছোটোদের দুধ বড়োদের... দেখো আমাদের প্ল্যান অনেক। এই দুধ থেকেই বিভিন্ন রকম দুগ্ধজাত দ্রব্য যেমন লস্যি, ক্রিম মিল্ক, কোল্ড ড্রিংকস ইত্যাদি তৈরির কথাও ভাবা হচ্ছে। সময় লাগবে হয়তো। শুরুটা বড়োদের দুধ দিয়েই করা হল আর কী!

স্তব্ধ হয়ে যায় তিয়াষ। কোম্পানি আরও দুগ্ধজাত দ্রব্যের কথা ভাবছে মানে তো...

- এত দুধ পাবেন কোথায়?

- কেন, তোমরা আছ না? কেউ তো আর অন্যান্য দুধ ফ্যাক্টরির মতো ইচ্ছে করে এসে দুধ জমা করবে না, তাই তোমাদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব নিয়েই বিনিময়ে তোমাদের থেকে দুধ সংগ্রহ করব।

তিয়াষের গা ঘিন ঘিন করে উঠে মিস বাসুর এরকম কথা শুনে।

- চলো, তোমাকে আজ একটা লাক্সারি দেব যা এই ফ্যাক্টরির কোনো বন্দিনী আজ অব্দি পায়নি। পুরো ফ্যাক্টরির একটা ট্যুর করাব। কীভাবে তোমাদের দুধ প্যাকেটজাত হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে শহরের কোনায় কোনায়, তার একটা আভাস হয়তো পেয়ে যাবে আজ। হয়তো তোমার খারাপ লাগাটুকুও বদলে যাবে। রাজি?

তিয়াষ ভাবতেও পারেনি তার কাছে এরকম একটা সুযোগ আসবে। সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

মিস বাসু ল্যান্ডফোনে কাকে যেন ফোন করে আসতে বলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন বৈজ্ঞানিক গোছের ব্যক্তি এসে উপস্থিত হয়। মিস বাসু তাকে বলেন,

- ইনি তিয়াষ। ওঁকে আমাদের ইউনিটের কাজ, মেশিনারি ওয়ার্ক সব একবার পরিদর্শন করাও।

তিয়াষকে নিয়ে ওই বিজ্ঞানী বেরিয়ে পড়ে পরিদর্শনে। মেয়েদুটি থেকে যায় মিস বাসুর কেবিনেই। হয়তো এবার তিয়াষের অনুপস্থিতিতে ভালোভাবে ব্রেইনওয়াশ হবে এদের।

বিজ্ঞানী তিয়াষকে একটি ইউনিটের সামনে এনে বলল,

- আমাদের প্রতি ফ্লোরেই এরকম ইউনিট আছে। আপনাকে এই ইউনিটটা বোঝালেই আপনি সবটা বুঝে যাবেন।

তিয়াষ মাথা নাড়ে।

- প্রথমে আমরা কাঁচা দুধ কালেক্ট করি। ফ্যাক্টরির সমস্ত বন্দিনী দিনে দু'বার, কখনও কখনও তিন থেকে চারবার র-মিল্ক কালেক্টারের সামনে এসে বসেন। সেখানে অটোমেটিক মিল্ক কালেক্টার ব্রেস্টে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এর ভেতরের নল ভাইব্রেশনের মাধ্যমে ব্রেস্ট থেকে টেনে দুধ বার করে যা একটি নলের মাধ্যমে জমা হতে থাকে নলের অন্যপ্রান্তে রাখা পাত্রে।

তিয়াষ দেখল সেই মিল্ক কালেক্টার যন্ত্রটিকে। একটি বিছানার পাশে রাখা আছে সে যন্ত্র। সেই বিছানায় শুয়ে থাকে মেয়েরা, আর দুই বুকে লাগানো থাকে যন্ত্র। দুধ জমা হয় সামনে রাখা কালো সিলিন্ডারের মতো দেখতে পাত্রে।

- এবার পাত্রে জমা হওয়া দুধ আমরা মিল্ক টেস্টিং মেশিনে নিয়ে যাই। দেখে নিই যে দুধ আমরা পেয়েছি তা ভালো কোয়ালিটির কি না। এ কাজে অটো ইলেকট্রনিক মিল্ক টেস্টার ব্যবহার করা হয়। দুধের অল্প স্যাম্পল এতে দিলেই ডিজিটাল মিটারে সে জানিয়ে দেয় দুধ ভালো কি মন্দ কোয়ালিটির। সেখান থেকে সব ভালো কোয়ালিটির দুধ আমরা জমা করি বাল্ক চিলারে। সবার দুধ প্রথমে সেখানে জমা হয়। সেখানে দুধ ঠান্ডা করা হয়। তারপর সেখান থেকে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় সে দুধ স্থানান্তরিত হয় আইসোলেটেড ট্যাংকারে।

তিয়াষ দেখতে পায় একটি সুবিশাল বাল্ক চিলার যেখানে প্রাপ্ত দুধ জমা হচ্ছে। সেখান থেকে ম্যানুয়ালি আইসোলেটেড ট্যাংকারে দুধ পাঠাচ্ছে ফ্যাক্টরির পুরুষ কর্মীরা। আইসোলেটেড ট্যাংকারের সংখ্যা প্রচুর।

এবার তিয়াষকে একটি ল্যাবরেটরিতে নিয়ে উপস্থিত হয় সেই বিজ্ঞানী।

- এখানে আইসোলেটেড ট্যাঙ্কার থেকে দুধ এনে আমরা দেখি সেই দুধ ল্যাবটেস্টের সমস্ত প্যারামিটারের বেসিসে গ্রহণযোগ্য কি না।

তিয়াষ দেখতে পায় ল্যাবে অনেক পুরুষ বিজ্ঞানী প্রাপ্ত দুধের নমুনা বিভিন্ন টেস্টটিউব ও বিকারে নিয়ে পরীক্ষা করছে।

- চলুন, এবার সাইলোজ দেখাই আপনাকে।

বিজ্ঞানী এবার একটা স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি অতি দীর্ঘ সাইলোজের সামনে এনে দাঁড় করায় তিয়াষকে।

- এই সাইলোতে এসে সেই দুধ জমা হয় যে দুধের স্যাম্পল ল্যাবে ইতোমধ্যে পরীক্ষায় পাশ করে গেছে। এর ভেতরের তাপমাত্রা সবসময় নজরদারির মধ্যে রাখতে হয়।

দেখা শেষ করে তিয়াষকে নিয়ে বিজ্ঞানী হাজির হয় অন্য এক ইউনিটের সামনে যেখানে ক্রিসক্রস করে অসংখ্য স্টেইনলেস স্টিলের টিউব সাজানো রয়েছে। সেইসব টিউব গিয়ে মিলিত হচ্ছে একটি বড়ো প্রকোষ্ঠে।

- এটা হচ্ছে আমাদের পাস্তুরাইজেশান ইউনিট। দুধের সমস্ত ব্যাকটেরিয়া নাশ করার জন্যে আমরা এখানে প্রথমে দুধকে গরম করি। সাধারণত ৭২.৫ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম করা হয় দুধ। গরম দুধকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা করা হয় পরের প্রকোষ্ঠে। এতে দুধের সমস্ত ব্যাকটেরিয়া নষ্ট হয়। এই দুধকে আমরা হোমোজিনাইজ করে মিক্স করি। চলুন, হোমোজিনাইজেশান আপনাকে দেখাই।

তিয়াষ এবার দেখতে পায় একটি বড়ো মেশিন যার মধ্যে তিনটি চ্যানেলের মাধ্যমে পাস্তুরাইজড মিল্ক পাঠানো হচ্ছে।

- এই মেশিনে ভেতরে আলাদা আলাদা পিস্টন লাগানো আছে। উচ্চবেগে যখন পাস্তুরাইজড মিল্ক এতে আসে, তখন পিস্টনের চাপে ফ্যাট এবং মিল্ক পার্টিকল ভেঙে যায়। সেই ভেঙে যাবার ফলে ফ্যাট এবং মিল্ক পার্টিকল খুব ভালোভাবে মিশে যায় যা দেহের পুষ্টির জন্য জরুরি।

তিয়াষ সম্পূর্ণ ইউনিটটা এখানেই শেষ ধরেই নিয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞানী তাকে হাটতে হাটতে প্যাকেটিং ইউনিটের সামনে নিয়ে আসে। তিয়াষ দেখতে পেল 'মা' ব্র্যান্ডের লোগো লাগানো অনেক প্যাকেটিং রোল। রোলগুলোকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মধ্যে দিলে সেই যন্ত্র নিজেই রোল কেটে কেটে সিলিন্ড্রিক্যাল আকার দিয়ে দিচ্ছে। দুধ যখন চ্যানেল বেয়ে আসছে তখন নিজে থেকেই তা এসে পড়ছে প্যাকেটের মধ্যে। লেজার বিম দিয়ে সেই প্যাকেট আটকে দেওয়া হচ্ছে। সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটি স্বয়ংক্রিয় হওয়ায় সেই প্যাকেটজাত দুধ এসে

জমা হচ্ছে মেশিনের শেষপ্রান্তে। মিনিটে প্রায় আশিটি প্যাকেট তৈরি করতে পারে এই যন্ত্র।

একদম শেষে হ্যান্ডপিক করে লাল রঙের ট্রে-তে সেই দুধের প্যাকেট তুলে রেখে দিচ্ছেন কর্মীরা। তারপর সে দুধ ট্রলিতে করে রওনা দিচ্ছে শহরের উদ্দেশে।

সেই বিজ্ঞানী তিয়াষকে আবার মিস বাসুর কেবিনে পৌঁছে দেয়। ফেরার পথে কথায় কথায় বিজ্ঞানী থেকে তিয়াষ জানতে পারে যে আরও অনেক প্রজেক্ট শুরু হবে। তাই হয়তো ফ্যাক্টরির সংখ্যাও বাড়বে। কেবিনে পৌঁছে দিয়ে বিজ্ঞানী বিদায় নেয়।

এই ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই মনে হল মেয়ে দুটির ব্রেইনওয়াশ কম্পলিট। আগের মতো ভয় আর এদের মুখে দেখতে পায় না তিয়াষ।

- কেমন লাগল আমাদের ফ্যাক্টরি?

- সব ভালো, শুধু কিছু চূড়ান্ত খারাপের মাঝে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। এত এত মহিলাকে কষ্ট দিচ্ছেন, রোজ কত শত বাচ্চার প্রাণ নিচ্ছেন! আর এদিকে দুধ যেন ব্যাকটেরিয়া মুক্ত থাকে তার সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন, অথচ মানুষের অমানুষিক চিন্তাভাবনাকে ব্যাকটেরিয়ামুক্ত করার কোনো যন্ত্র নেই আপনার। আর যদি আপনার কোম্পানির দুধ এত ভালোই হত তাহলে বন্দিদের এই দুধই দেওয়া হত পুষ্টির কথা ভেবে, গোরুর দুধ দেওয়া হত না।

এবার মিস বাসু খেপে গেলেন। বাইরে দাঁড়ানো দু'জন ষন্ডাকে ডাকতেই তারা তিয়াষকে টেনে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে নিয়ে চলল তার সেলের দিকে। তিয়াষের বোঝা উচিত ছিল এই ফ্যাক্টরিতে মিস বাসুর বিরোধিতা করা বারণ।

তিয়াষ তবু যেতে যেতেও চিৎকার করে বলতে থাকে,

- বাইরের দুনিয়া আমি দেখব কি না জানি না, কিন্তু বাকি বন্দিরা সবাই দেখবে। দেখবেই... দেখবেই! ব্যাবসার জন্যে মায়ের দুধ আপনি বিক্রি করছেন সেটা যদিও বা মেনে নিই, যে পাপ আপনি করছেন তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। শিশুহত্যার মতো পাপের একটাই শাস্তি— মৃত্যু!

তিয়াষকে নিয়ে দু'জন বেরিয়ে গেল, মিস বাসু চোখ বন্ধ করলেন।

৬

তিয়াষ গতকাল নিজের সেলে ফিরে সারাদিন ভেবেছে। যা সে দেখেছে তা এই শহরের সাধারণ মানুষ কেউ জানে না। এই সাময়িক হুজুগে শহরের যে মর্মান্তিক পরিণতি হতে পারে তা ভাবলেও গা শিউরে উঠে তার। কত কত পরিবার, মূলত দরিদ্র পরিবার তাদের মেয়ে হারাবে, কত সন্তান তার মা হারাবে, নারীপাচার চক্র শক্তিশালী হবে, কত কত মানুষ তার জীবনের একটা বড়ো সময় কালকুঠুরিতে যন্ত্রবৎ কাটিয়ে দেবে— ভাবতে পারেনি আর তিয়াষ। রাতে খাওয়ার পর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে মনে নেই তার।

পরদিন থেকে নিজের স্নায়ুকে আরও শক্ত করার চেষ্টা করে সে। এসব খবর যদি ফাঁস করতেই হয়, এই ব্যাবসা বন্ধ করে এত এত লোককে যদি বাড়ি ফেরাতে হয়, তাহলে তিয়াষকে শান্ত মাথায় এগোতে হবে। সবকিছু দেখে বুঝে নখদর্পণে রাখতে হবে।

আজ ভোরবেলায় এবং দুপুরের দিকে সে দেখেছে বাছাই করা শ'খানেক মহিলাকে সার বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর নিয়ে যাওয়ার পরেই ঘড়ঘড় শব্দে কিছু মেশিন চলে উঠল যেন। মেশিনগুলো কাল দেখা হয়ে গেছে। মিল্ক কালেক্টরের শব্দ এটা। প্রায় ঘণ্টা খানেক পর একে একে সবাই ফিরে এল। সবাই বুকে হাত চেপে রেখেছিল। মুখে ব্যথার ছাপ স্পষ্ট সবার। এসে নির্দিষ্ট করা খাবার খেয়ে সবাই একে একে ঘুমিয়ে পড়ল। কেউ কারও সঙ্গে কোনো কথা বলল না। এ এক অদ্ভুত জীবন।

তারপর আরও একশো জন চলে যায় মিল্ক কালেক্টরের দিকে। এভাবে দফায় দফায় চলতেই থাকে আসা-যাওয়া।

রাতের বেলায় সে অভিজ্ঞতা পায় আর এক পৈশাচিক ভবিতব্যের। রাত তখন ক'টা বোঝার উপায় নেই। কারণ এখানে ঘড়ি নেই। একদল পুরুষকে এই হলঘরে ঢুকতে দেখে তিয়াষ। সংখ্যায় কত ঠিক বোঝা যায় না।। লিস্ট মিলিয়ে প্রায় কুড়িজন মেয়ে আর মহিলাকে নিয়ে যাওয়া হয়। নতুন দুটো মেয়েও ছিল তার মধ্যে। তিয়াষের মনে পড়ে আজ সকালেই ওরা বলছিল ওদের সব রিপোর্টই নাকি নর্মাল এসেছে আর এখানকার কাজটা নাকি মন্দ নয়। তিয়াষ বুঝে গিয়েছিল কেন এখানে মেয়ে এনেই তাদের ব্রেইনওয়াশ করা হয়। এতে কাজে গতি

আসে। এই যেমন আজ কর্তৃপক্ষ আর কালবিলম্ব করেনি, মেয়েদুটোকে পুরুষের হাতে তুলে দিল। তিয়াষ দুইয়ে দুইয়ে চার করতেই সেটা বুঝে গেছে। তবে এভাবে সবটা বোঝা যাচ্ছে না। তিয়াষ ঠিক করে কাল সকালেই একজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সম্পূর্ণ সিস্টেমটা কাল সে বুঝে গেছে। তবুও এখানকার বন্দিনীরা সাহায্য না করলে এই সিস্টেম ভেঙে বেরোনো সম্ভব নয়। আবার ঘুম আসছে। এত ঘুম তার আসে না। সে বুঝতে পারে খাবারে স্থাণুবৎ হয়ে থাকার কোনো মেডিসিন অবশ্যই দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

পরদিন সকালে যখন ঘুম থেকে উঠেই সে দেখে পাশেই পড়ে আছে মেয়েদুটো। ছিবড়ে হয়ে যাওয়া নারীশরীর হয়ে পড়ে আছে। তিয়াষ বুঝতে পারে তার পরিণতিও এটাই হতে চলেছে। মানসিক প্রস্তুতি শুরু করে সে।

তবে আজ বন্দিনীদের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করার সিদ্ধান্তও নেয় সে। সকাল থেকেই সে এরকম একজনের সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করে যে কিনা এখানে অনেকটা সময় ধরে আছে। এরকম বেশ কয়েক জনের সঙ্গে কথাও বলে সে। কিন্তু একটা-দুটো শব্দের পর তারা আর কথা বলে না। কথা বলার অবস্থাতেই নেই তারা। শেষ পর্যন্ত তার আলাপ হয় জয়িতা বলে একটি মেয়ের সঙ্গে। জয়িতা সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। এখানকার জীবনে অভ্যস্ত, কিন্তু এখনও ডিপ্রেশনে যায়নি।

জয়িতা বলে,

- এক বছর হয়ে এল, সূর্য ওঠা দেখি না। অথচ একটা সময় ছিল প্রতিদিন সকালে উঠতাম শুধু সূর্যোদয় দেখতে।

- জয়িতা, আমি এখানে এসেছি দু'দিন হয়েছে। আমি পেশায় সাংবাদিক। এখনও এখানকার বেশিরভাগ মানুষের মতো ডিপ্রেশন আমাকে গ্রাস করেনি। ব্রেইনওয়াশ করা হয়নি আমার এখনও। সুস্থভাবে চিন্তা করতে পারছি। আমাকে এখানকার সবকিছু একটু খুলে বলতে পারবে? হয়তো তোমার সূর্যোদয় দেখা আবার ফিরিয়ে দিতে পারব।

জয়িতা শেষ কথাটা শুনে হাত চেপে ধরে তিয়াষের।

- পারবে? পারবে সবাইকে মুক্তি দিতে?

হাতে ভরসার ওজন চাপায় তিয়াষা। জয়িতা বলতে শুরু করে,

- বাইরে যে 'মা' ব্র্যান্ডের ব্রেস্ট মিল্ক বিক্রি হয় সেই মা ব্র্যান্ডের

ফ্যাক্টরি এটা আর আমরা হচ্ছি সেইসব দুধেল গাই, যাদের নিংড়ে ব্যাবসা চলছে। আশা করি এতটুকু তুমি নিজেই বুঝে গেছ। খুব সিস্টেম্যাটিক প্রসেস। এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রজনন-ক্ষমতাধর মেয়েদের চালান করা হয়। এখানেই তাদের সমস্ত টেস্ট করে দেখে নেওয়া হয় যদি তাদের ওপর ইনভেস্ট করা হয় ভবিষ্যতে রিটার্ন কীরকম আসতে পারে। যদি সব রিপোর্ট ভালো থাকে তবে দেখে নেয় প্রোল্যাক্টিন হরমোন, যেটা আমাদের মস্তিষ্কের পিট্যুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে নির্গত হয় এবং যা ব্রেস্ট মিল্ক উৎপাদনের জন্য দায়ী, সেটা শরীরে কী অবস্থায় আছে। যদি সেটাকে জাগ্রত করার মতো অবস্থায় আমাদের শরীর ন্যাচারালি থেকে থাকে তবে এরা মেডিসিনের মাধ্যমে সেটাকে যথাসম্ভব জাগ্রত করে দেয়। সেক্ষেত্রে মা না হয়েও আমাদের থেকে ব্রেস্ট মিল্ক এরা বের করতে পারে। এখানে অনেকেই আছে যাদের সঙ্গে এরকম হয়েছে। আর যাদের মা হওয়া ছাড়া উপায় নেই, মানে প্রোল্যাক্টিনের সঙ্গে অক্সিটোসিন হরমোনের প্রয়োজন, যা বাচ্চার সঙ্গে মা'কে ইমোশানালি অ্যাটাচ করে এবং বাচ্চা মায়ের নিপল চুষলেই দুধ বেরোবে অবস্থায় থাকে, তাদের এখানে প্রেগন্যান্ট করা হয়।

- প্রেগন্যান্ট করা হয়?

- হ্যাঁ, আর তা সম্পূর্ণ ইচ্ছের বিরুদ্ধে। বাইরের পৃথিবীতে একে আমরা ধর্ষণ বলি, যে করে তাকে যাবজ্জীবন বা ফাঁসি দেওয়ার জন্য মোমবাতি মিছিল-টিছিল ইত্যাদি করি। কিন্তু এখানে যে যত বেশি মেয়েদের ধর্ষণ করে প্রেগন্যান্ট করতে পারে, তার পদোন্নতি হয়।

- হোয়াট রাবিশ? ছি!

- হুম। কিছু মেইল এসকর্ট সংস্থার সঙ্গে এদের টাই-আপ আছে। সেরকম ভালোজাতের বীর্যের অধিকারী পুরুষদের নির্বাচন করে আমাদের কাছে পাঠানো হয়। কাল রাতে দেখেছ তো তুমি।

- হ্যাঁ, দেখেছি। আর দেখার পর থেকেই ঘেন্না হচ্ছে।

- সবার হয় শুরুতে। কিন্তু তারপর দৈনন্দিন রুটিনে পরিণত হয়ে গেলে আর কোনো অনুভূতি কাজ করে না।

- দুটো প্রশ্ন আছে?

- মাত্র দুটো?

হাসে জয়িতা,

- আমার এতদিন পরেও হাজারটা প্রশ্ন আছে। পার্থক্য হচ্ছে আমি এতদিনে খোঁজা বন্ধ করে দিয়েছি। বলো।

- তুমি এত কিছু জানলে কীভাবে? মানে এত ডিটেইলসে তুমি বলছ তাই জিজ্ঞেস করছি।

- দুঃখের জায়গাতেই হাতটা রাখলে। মেডিক্যাল পড়া শেষ করার পরপর যখন গাইনোকোলিজস্ট হব ঠিক করেই নিয়েছি এরকম একদিন বাড়ি ফেরার পথে অপহরণ। জানি না মা-বাবা এখনও আমাকে খুঁজে চলেছে, না কি আশা হারিয়ে ফেলেছে। তাই আমার পক্ষে প্রসেসটা এতদিনে ধরতে এতটুকু অসুবিধে হয়নি। দ্বিতীয়টা বলো।

জয়িতার কথা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিয়াষ। না জানি আর কত কত মেয়ে এই চক্রের বলি হবে!

- যারা মা হবার আগে প্রোল্যাক্টিন ক্ষরণে সক্ষম নয় বা মেডিসিন প্রয়োগে যাদের ব্রেস্ট মিল্ক উৎপাদন সম্ভব নয়, শুধু কি তাদেরই ধর্ষণ হয় এখানে?

- আংশিক সত্য। হ্যাঁ, তারা অগ্রাধিকার পায়, কারণ এতে ইন্সট্যান্ট বিজনেস শুরু হয়ে যায় এক বছরের মধ্যেই। কিন্তু ধর্ষণ প্রত্যেকের হয়। ইচ ওয়ান অফ আস।

- আর সেটা কেন?

- লং টার্ম বিজনেস পলিসি। সিম্পল। যদি আমাদের কন্যাসন্তান জন্ম নেয়, তবে তাদের আলাদা সেলে রেখে বড়ো করা হয়। সেক্ষেত্রে আজ থেকে আঠারো কিম্বা কুড়ি বছর পর নতুন মেয়ে বাজার থেকে কিনতে হবে না। আর কিনতে হলেও কম কিনতে হবে। আর যদি ভুল করেও পুত্রসন্তান হয়...

- থাক সে কথা। আমি দেখেছি সে দৃশ্য।

কথা বলার ফাঁকেই কখন একজন হাতে একটা কাগজ নিয়ে সেলের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে জয়িতা আর তিয়াষ লক্ষ করেনি। নাম ধরে ডাকছে একে একে। জয়িতার নামও ডাকল। জয়িতা বলে,

- যাই, সময় হয়েছে, দুধ দিয়ে আসি।

- কীভাবে নেয়?

তিয়াষ সবটা কাল জেনে এসেছে। শুধু জয়িতার উত্তর পেতেই আলাদাভাবে প্রশ্নটা করে।

কষ্টের হাসি হাসে জয়িতা। আর তারপর তিয়াসকে অবাক করে তিয়াষের সামনেই জামার বোতামগুলো খুলতে থাকে। ব্রা পরেনি সে। তাই তিনটে বোতাম খুলতেই জয়িতার স্তনজোড়া বাইরে বেড়িয়ে আসে। দেখে শিউরে উঠে তিয়াষ। বৃন্তের বৃত্তের এক ইঞ্চিটাক লাল টকটকে হয়ে আছে। জয়িতা তিয়াষের হাতটা ধরে নিজের বৃন্তে ছোঁয়ায়। ভীষণরকম খসখসে। ফুলকে পায়ের তলায় বালুতে ঘষে হাতে নিলে যেরকম খসখসে হয়ে যায় তার পাপড়ি, ঠিক সেরকম।

- রোজ দুটি কাপ মেশিন বসিয়ে দেওয়া হয় চেপে। বাকি কাজ মেশিন করে নেয়। অন্যান্য মেশিন ফুড অ্যানালাইজিংয়ের ভিত্তিতে তার এক্সপায়ারি ঠিক করে। প্রতিদিন দু'বেলা দুধেলা গাইয়ের মতো দুধ দিতে যাই। আর আমাকে পেয়ে তো এরা সোনায় সোহাগা। কোলে সন্তান পেলাম না, অথচ প্রোল্যাক্টিনের মহিমায় দুধ দিচ্ছি, ব্যাবসা বাড়াচ্ছি এদের।

জামার বোতাম আটকে মেশিন রুমে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় জয়িতা। তিয়াষ তার হাতটা ধরে ফেলে,

- খুব কষ্ট হয় না রোজ?

- গতমাসে ছেলে হারিয়েছি। এর থেকে বেশি হয় না।

ভিড়ে মিশে যায় জয়িতা।

৭

রিপোর্ট এসে গেছে সাতদিন। কিন্তু এখনও রাতের জলসায় তিয়াষের নম্বর আসেনি। প্রতিদিন ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে মেয়েটা। আগের মতো অপ্রতিরোধ্য বোধহয় নেই আর সে। অন্তত বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে বাড়ির কথা, বাবা-মায়ের কথা ভেবে কাঁদে একা একা। জয়ের কথাও ভাবে সে। বেঁচে আছে কি না কে জানে। সেদিনের অভিযানের কথা সবাই জানত, কিন্তু সে নিরুদ্দেশ হবার পর এখন অব্দি এখানে কেউ এসে পৌঁছল না। হয়তো এফআইআর হয়েছে। কিন্তু তথ্য-প্রমাণ ছাড়া কী'ই বা করা সম্ভব! হয়তো পুলিশ হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে 'মা' ব্র্যান্ডের নামে এরকম এফআইআরের কথা। রাজ্যে এত বড়ো ব্যাবসা চালাচ্ছে, প্রফিটের টাকায় এনজিও, ঝুড়ি ঝুড়ি সাফল্যের মাঝে একটা অভিযোগ চাপা পড়ে যাবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

খাবার দিয়ে যায় একটা লোক। সঙ্গে একটা ক্যাপসুল। রিপোর্টে লেখা ছিল তিয়াষের মধ্যে প্রোল্যাক্টিন অতি দ্রুত জাগ্রত হবার সম্ভাবনার কথা।

এভাবেই তিন মাস কেটে গেল। এখনও কোনো অজানা কারণে তিয়াষের ডাক এল না। তবে এখন তিয়াষের বুকে জোয়ার আসে রোজ। পনেরো দিন হল তাকে মেশিন ঘরে যেতে হয়। সে'ও এখন আর ব্রা পরে না। প্রতিটা মেশিনের সঙ্গে একটা শুয়ে থাকার জায়গা আছে। তাতে গা এলিয়ে এখন নিজে নিজেই গায়ের জামা সরিয়ে নেয় সে। মেশিনের কাপদুটি আর প্রথমদিনের মতো জোর করে তাকে পরিয়ে দিতে হয় না। মাঝারি আয়তনের স্তনদুটোতে কাপের স্ক্রু ঘুরিয়ে আটকাতে শিখে গেছে সে। নিজেই করে নেয়। লোকগুলো হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তিয়াষ ভ্রুক্ষেপও করে না। নিংড়ানো বন্ধ হয়ে গেলে মেশিন নিজে থেকেই বন্ধ হয়। তিয়াষ জামা বন্ধ করতে করতে নিজের সেলে ফিরে আসে। এটাই রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজ দিনটা অন্যরকম ছিল। খেয়েদেয়ে ঘুমাতে যাবে বলে যখন প্রস্তুতি নিচ্ছে ঠিক তখনই একজন এসে অন্য অনেকের মধ্যে তিয়াষের নাম ধরে ডাকলো। ধর্ষিত হবার খোলা আমন্ত্রণ চলে এল।

এই তিনমাসে মানসিকভাবে অনেকটাই তৈরি ছিল তিয়াষ আজকের দিনটার জন্য। সেল থেকে বেরিয়ে নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে বসল সে। ছোটো ঘর। আলো কম হলেও মানুষ দেখা যাওয়ার মতো, আর ভালো দিক হল এতে অন্তত কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি লোক ঘরটাতে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। ক্লান্ত লাগছিল তাকে। হয়তো অন্য কোনো ঘরে বেশ ধস্তাধস্তি করতে হয়েছে। এসেই তিয়াষের পেটিকোট খুলতে যাচ্ছিল। তিয়াষ বাধা না দিয়ে বলল,

- তাড়া কী? বসো। ক্লান্ত হয়ে আছ।

লোকটা হকচকিয়ে গেল। এত ভালোভাবে বোধহয় এতদিনে কেউ কথা বলেনি তার সঙ্গে। সে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়। তিয়াষ আবার বলে,

- চালাকি করার মতো অবস্থায় এরা রাখেনি। ঘেমে আছ বলেই বললাম। বসো। যা করতে এসেছ সেটা তোমাকে করতেই হবে। রেস্ট নিতে তো আপত্তি নেই।

লোকটা বসে পড়ে। তিয়াষ তাকে ভালোভাবে দেখে। দশাসই চেহারা। এত কাছ থেকে মেইল এসকর্ট এই প্রথম দেখছে তিয়াষ। লোকটার দিকে পাশে রাখা একগ্লাস জল এগিয়ে দেয় সে। ঢকঢক করে সেটুকু খেয়ে ফেলে সে।

- স্বাভাবিক জীবন থেকে বেরিয়ে এগুলো করতে কষ্ট হয় না? আমাদের থেকে কতটা বেশি স্বাধীন তোমরা?

এই প্রথম লোকটা কথা বলে,

- উত্তরটা এতদিনে পচে গেছে। কেউ ইচ্ছে করে ইত্যাদি প্রভৃতি।

তিয়াষ বুঝতে পারে লোকটা এই কাজ করলেও মাথায় গ্রে সেল আছে। তার উত্তরে সেটা স্পষ্ট। সে সরাসরি একটা প্রস্তাব দেয়,

- দেখো আমরা যে কারণে বন্দি কিম্বা তোমাকে যে জন্যে আমার সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে সেক্স করতে হবে সেগুলো আমি বা তুমি না চাইলেও করতেই হবে। তুমি না করলে অন্য কেউ করবে। আচ্ছা, আমরা একে অপরকে ভালোবাসতে পারি না? অন্তত বন্ধুত্ব?

- মানে?

লোকটা স্বাভাবিকভাবেই আকাশ থেকে পড়ল। মেয়েটা পাগল, না কি ওপরচালাক?

- মানে যা বললাম তার বাইরে কিছু নয়। সেক্সটা একটা প্লেজার। জোর-জবরদস্তির কিছু নয়। এই যে তুমি অন্য ঘর থেকে এলে এবং এসেই হাঁফাতে হাঁফাতে আমার পেটিকোট খুলতে গেছিলে তাতে তোমার কোনো প্লেজার ছিল কি?

- আমাদের ওসব থাকতে নেই।

- সেটাই তো বলছি। কেন থাকতে নেই? আমরা মানুষ নই বুঝি?

- দেখো, কোনো চালাকি করলে আমি কিন্তু জানিয়ে দেব।

তিয়াষ এবার উঠে দাঁড়ায়। নিজের জামার দুটো বোতাম খোলে এবং নিজের স্তনদুটো লোকটার দু'হাতে তুলে দিতে এগোয়। উঠে বসে লোকটার জঙ্ঘাদেশে উঠে বসে সে।

- তুমি যা চাইছ আমি তোমাকে তা দিতে চাই। শুধু চাই তুমি তা অর্জন করো।

কথাটা বলে হাতটা নিজের ক্লিভেজের দিকে নিতেই লোকটা হাত সরিয়ে ফেলে।

- কী করছেন এসব?

তিয়াষ এবার লোকটার চোখে চোখ রেখে হাসে,

- যন্ত্রমানব থেকে আবার মানুষের প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

ওইদিনের এই ঘটনার পর প্রায় প্রতি রাতেই তিয়াষের সঙ্গে লোকটার রাতে দেখা হয়, কথা হয়, হালকা সুরে গান হয়। হাসি হয়, আনন্দ হয়, দুঃখগুলোর ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়। কিন্তু যে কাজে তাদের দেখা সে কাজ তারা এড়িয়ে যায়। সেকথা কেউ জানতেও পারে না। যেহেতু ছ'মাসের মধ্যে পার্টনার পালটানোর নিয়ম নেই এই ফ্যাক্টরিতে, তাই তারাও নিজেদের সময়টা উপভোগ করতে থাকে। লোকটাকে তার দলের সবাই রেক্স বলে ডাকে। কিন্তু তিয়াষ তাকে নিজের মতো করে নাম দিয়েছে 'স্পন্দন'। হয়তো তার মৃতবৎ জীবনে আবার স্পন্দন ফিরিয়ে আনার জন্য।

স্পন্দনের মধ্যেও পরিবর্তন এল। এই কাজ করার জন্য তার মধ্যে যে ডিপ্রেশনগুলো ছিল তা তিয়াষের সংস্পর্শে এসে কমে গেল। স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে সে। অন্য ঘরে না গিয়ে শুরুতেই তিয়াষের কাছে ডিউটি নিয়ে নেয় এবং সেখানেই সবটা সময় কাটিয়ে দেয়। একে অপরের সময় খুব উপভোগ করে দু'জনেই। দিনের বেলার সব কাজের মধ্যেও অধীর আগ্রহে রাতের অপেক্ষায় থাকে এরা।

স্পন্দনের পূর্বজীবন নিয়ে তিয়াষ জানতে চেয়েছে বহুবার। স্পন্দন এড়িয়ে যায়। যেন সেই অতীত তার বুকে সিরিঞ্জ ভরা ব্যথা ইনজেক্ট করে। তবু আজ তিয়াষ আজ আবার বলে,

- বলে দেখোই না একবার। তুমি বলবে, আমি শুনব তারপর আর এ নিয়ে কথা হবে না। আমাকেই দেখো। আমার অতীত, জয়ের সঙ্গে থাকার কথা, সাংবাদিকতা জীবনের কথা সব তোমায় বলেছি। এখানে এসে যখন কাউকে পাচ্ছিলাম না, তখন তোমায় আঁকড়ে ধরে সব ভুলে গেছি। এখন মনে হয় এভাবেই যদি দিন কাটে...

- না, না। এভাবে জীবন কাটাব না। আমরা একসঙ্গে ভালোভাবে থাকব। অন্য পাঁচজনের মতো।

স্পন্দন তিয়াষকে থামিয়ে বলে ওঠে। তিয়াষ এ প্রশ্নের উত্তর দেয় না। যেন এ সুখ মরীচিকা, লোভে পা বাড়িয়ে তলিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা খোলা নেই। স্পন্দনের বুকে আঙুল চালিয়ে সে শুধু বলে,

- হবে, সব হবে। শুধু আমরা নই, সবাই এখান থেকে মুক্তি পাব।

সবাই নিজের নিজের ঘরের ছাদের নিচে শান্তির ঘুম ঘুমাব। আর এসব সম্ভব হবে আমাদের ভালোবাসার জন্যেই। তুমি দেখে নিয়ো।

তিয়াষের গাল বেয়ে জলের ফোঁটাগুলো স্পন্দনের বুকে এসে পড়ল। স্পন্দন তিয়াষকে বুকে টেনে নিল।

- এই, তুমি না শুনতে চেয়েছিলে আমার পূর্ব-পরিচয়। জানো, আমি না খুব ভালো ছাত্র ছিলাম। স্কুলের কিছু স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে সুযোগ পেয়েছিলাম পড়ার। মধ্যবিত্ত ঘরে শুধু টাকারই অভাব থাকে না, থাকে সাহসেরও অভাব। আমরা এক ভাই এক বোন। মা-বাবা রাজি হননি ছেলেকে এতদূর পাঠাতে। আসলে ভয় পেয়েছিলেন, যদি আর না ফিরি। বাবার একটা রেশন শপ ছিল। তাতে বেশ ভালোই কেটে যেত আমাদের। আমিও এখানেই কলেজে ভরতি হই। সেখানেও ভালো ফলাফল করছিলাম। কিন্তু লাস্ট ইয়ারে গিয়ে জীবনটা পুরো পালটে গেল। শাসক দলে পরিবর্তন আসে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে খুন হয় বাবা। অথচ বাবাকে ছোটোবেলা থেকে আমজনতার বাইরে কোনো রাজনৈতিক কার্যকলাপে যেতে দেখিনি। বাবা বলত, "রাজনীতি পেঁয়াজ, আলুর দামের সঙ্গেও জড়িত। তাই রাজনীতির সঙ্গে আমরা সবাই জড়িত। কিন্তু তাই বলে আমরা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ যদি রাজনীতিতে জীবন খুঁজি, তবে ঘরের মানুষ না খেয়ে থাকবে। তাই তোদের ফেলে রাজনীতিতে জীবন উজাড় করতে আমি পারব না রে। আমি দূর থেকে আছি, ভোটবাক্সে আছি, রাজনৈতিক মতবাদে আছি। কিন্তু আমার পরিবার আগে, তাই সক্রিয় রাজনীতিতে আমি নেই।" অথচ এই লোকটার খুন নিয়ে রাজনীতির রঙের খেলা দেখেছি। একটা সময় এমন এল যে আমাদের রেশন শপের রেজিস্ট্রেশন ক্যানসেল করে পাড়ার অন্য এক ক্ষমতাধর লোককে দিয়ে দেওয়া হল লাইসেন্স। মা-বোনকে নিয়ে পথে বসার জোগাড় সেদিন এসেছিল, যেদিন পাড়া থেকে আমাদের একপ্রকার তাড়িয়েই দেওয়া হয়েছিল। নতুন পাড়ায় ভাড়া এলাম আমরা। অথচ ভাড়া দেওয়ার টাকা নেই। ততদিনে লাস্ট ইয়ারের পরীক্ষার ডেট পেরিয়ে গেছে। কাজের জন্য এখানে-সেখানে গলাধাক্কা, শেষে ঠাঁই হল এখানে। কাজটা ভালো নয় মানছি, কিন্তু আমাকে আমার পরিবারকে শুরুতে খাদ্যসংস্থান করে দিয়েছিল এই কাজই। এটা আমাকে মানতেই হবে।

স্পন্দনের হাতদুটো চেপে ধরে তিয়াষ। চুমু খায় ঠোঁটে।

- আমায় কথা দাও, পড়াশোনাটা আবার শুরু করবে তুমি।

স্পন্দন হাসে। মুখে বলতে থাকে,

- এই কাজ নিয়ে আমার লজ্জা নেই। আমার মতো হাজার হাজার যৌনকর্মী এই কাজ করছে, মাথা তুলে বাঁচার চেষ্টা করছে। তোমাদের সুশীল সমাজই আমাদের এই কাজ করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু আমার রাগটা অন্য জায়গায়। যেদিন থেকে এই 'মা' ব্র্যান্ড শুরু হল সেদিন থেকে কাজটাকে এথিক্যালি সাপোর্ট করতে পারছি না। এতগুলো মানুষকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে আটকে যে বেআইনি কাজটা হচ্ছে, নিজেকে তার অংশ ভেবে রাতে ঘুমাতে পারি না। আর এখন অন্য কোথাও যে কাজ পাব, সে রাস্তাও অনেকটা বন্ধ। তাই ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছি। একমাত্র তুমিই আবার আমার মনে জল সিঞ্চন করেছ। এবার মনে হয়, সত্যি হয়তো সম্ভব সেই জীবন। পারব আমরা, বলো পারব।

স্পন্দনের মাথাটা তিয়াষ বুকে জড়িয়ে ধরতেই দরজায় শব্দ হয়। কেউ ডাকছে,

- রেক্স, হয়ে গেলে চলে আয়। ওই মাগীর সঙ্গে এত পিরিত কীসের তোর!

স্পন্দন চোয়াল শক্ত করে। তিয়াষ চোখের ইশারায় চুপ থাকতে বলে স্পন্দনকে। স্পন্দন মিনিট পাঁচেক পর চলে যায়। তিয়াষ নিজের সেলে ফিরে আসে।

এভাবে কাটে আরও কিছুদিন।

কর্তৃপক্ষ এবার চাপ শুরু করে। তিয়াষের রিপোর্ট কেন পজিটিভ হচ্ছে না সে নিয়ে কথা শুরু হয়। টেস্ট করানো হয় তিয়াষের। সব রিপোর্ট ভালো। সন্দেহ শুরু হয়।

কিন্তু সন্দেহ মাথা চাড়া দেবার সুযোগ পায় না। দিন পনেরো পর একদিন রাতে যখন স্পন্দন আসে, তখন তিয়াষ তার কানে কানে বলে,

- আমাদের ভালোবাসার গাছে কুঁড়ি এসেছে।

খবরটা এর আগে বহুবার স্পন্দন পেয়েছিল। সবই অফিশিয়াল লেটারহেডে। এবার সেই খবর এক অন্তঃসত্ত্বা নারীর মুখে যেন অন্য এক ভুবন খুলে দিল। আনন্দে আত্মহারা হল দু'জনে।

কিন্তু এই আনন্দে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিষাদের ছায়া পড়ল। তিয়াষ স্পন্দনের কোলে মাথা রেখে বলল,

- তার মানে আজকেই আমার সঙ্গে তোমার শেষ দেখা। কারণ কোম্পানির হিসেবে তুমি তোমার কাজ করে দিয়েছ।

- আমিও সেটাই ভাবছি। কিন্তু দেখা তো আমাকে করতেই হবে। তোমাদের দু'জনের খবর আমি ঠিক নিয়ে নেব।

- কিন্তু কীভাবে?

- ভাবতে দাও। তোমার সেলে তোমার বিশ্বাসযোগ্য কয়েক জনের নাম আমায় বলো। আমি তোমাকে সময়মতো সব জানিয়ে দেব।

- আচ্ছা। আর একটা কথা।

- কী?

- এখানে ছেলে হলে কী করে আশা করি জানো।

- ও কথা মুখে এনো না। আমি ব্যবস্থা করছি কিছু।

- শুধু আমার জন্য নয়। এবার ব্যবস্থা সেলের সবার জন্যেই করতে হবে। প্রতি ফ্লোরে এরকম হাজার হাজার মহিলা বন্দিনী। মিস বাসুর সমস্ত কিছুই তো তোমাকে জানিয়েছি। এই 'মা' ব্র্যান্ড বন্ধ না হলে অনর্থ হয়ে যাবে দেশের হাজার হাজার ঘরে। সবাইকে মুক্ত করতে হবে।

- অসম্ভব! সবাই ঐক্যবদ্ধ না হলে সম্ভব নয়। সেলের সবার মধ্যে কখনও ঐক্য দেখেছ?

- দেখেছি। তুমি তোমার মতো সবকিছু তৈরি করো ধীরেসুস্থে। আমি ভেতরটা দেখছি।

ঘর থেকে বেরোবার আগে তিয়াষের মাথায়, গালে হাত রেখে স্পন্দন বলে,

- তোমাদের খেয়াল রেখো। আমি আছি।

৮

দিন দ্রুত কাটতে থাকে। এখন আর তিয়াষের সঙ্গে স্পন্দনের দেখা হয় না। তবে স্পন্দনের ডিউটি কোনোভাবে জয়িতার সঙ্গে ঠিক হয়েছে। স্পন্দনই ব্যাপারটা ম্যানেজ করেছে। তাই তিয়াষের কাছে জয়িতার মারফত স্পন্দনের সব খবরাখবর আসে। আর মজার ব্যাপার

জয়িতার সঙ্গে ডিউটি চলাকালীন স্পন্দন হয় ঘুমিয়ে কাটায়, নয় তিয়াষের ডেভেলপমেন্টের প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি জেনে কাটায়। এগুলি শুনে বেশ মজা লাগে তিয়াষের। প্রথম দিনের প্রায়-যন্ত্রমানবটির আজ এই বিবর্তন সত্যি তিয়াষকে অনেক ভরসা জোগায়, জীবনকে ভালোবাসতে শেখায়। যদিও জয়িতার সঙ্গে কথাবার্তা আর এত সহজ নেই। প্রেগন্যান্সির জন্যে তিয়াষকে গদিওয়ালা সেলে রাখা হয়েছে। জয়িতা রয়ে গেছে পুরোনো সেলেই।

এত ভালো কিছুর মধ্যেও ফ্যাক্টরিতে রোজ চলতে থাকে খুন, ধর্ষণ আর শিশুর অমৃত চুরি। কান্নাকাটি, চিৎকার, মৃত্যু এগুলি রোজনামচায় পরিণত।

এর মধ্যে একটি ঘটনা ঘটেছে। যে দু'টি মেয়ে তিয়াষের সঙ্গে এসেছিল তারা তিয়াষের অনেক আগেই প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়েছিল। তিয়াষের যখন পাঁচমাসের প্রেগন্যান্সি তখন ওই দু'জনের ফুল টার্ম হয়ে গেছে। দু'জনকেই রাখা হয়েছে আলাদা বেডে।

আজ সকালে একবার মিস বাসু পরিদর্শনে এসেছিলেন। তিয়াষ রয়েছে পাশের সেলে গদিতে। মেয়ে দু'জনকে দেখে মিস বাসু বললেন,

- একসঙ্গে এখানে এসেছিলে, প্রায় একই সময়ে প্রেগনেন্ট হয়েছ, তোমাদের ডেলিভারিও তাই একই দিনে করব। তোমাদের মেয়ে একই দিনে পৃথিবীতে আসবে আর একই সঙ্গে আমার এখানে বড়ো হবে। তারাও বান্ধবী হবে।

মিস বাসুর কথা কানে এলেই ঘেন্নায় তিয়াষার মুখ বিকৃত হয়। মিস বাসু আরও অনেক কথা বলেন, তিয়াষ আর সেদিকে কান দেয় না। শুধু ভাবতে থাকে সবাইকে কী করে এক জোট করা যায়। সময় এগিয়ে আসছে।

- দিন দশেকের মধ্যেই তোমরা দু'জনের ডেলিভারি করব। নর্মাল হলে ভালো, নইলে সিজার। আমি চাই মেয়েদু'টি একসঙ্গে পৃথিবীর আলো দেখুক।

মিস বাসু সবার চেক-আপ করে চলে গেলেন। তিয়াষের দুশ্চিন্তায় এল, যদি ছেলে হয় দু'জনের, তবে তো পৃথিবীর আলো দু'জনের জন্য একই সঙ্গে হয়তো নিভেও যাবে।

এখন সেলে এক নতুন নিয়ম হয়েছে। প্রেগন্যান্সি স্টেজের সেলগুলো পরিষ্কারের দায়িত্ব তুলনামূলক কর্মঠ বন্দিনীদের দেওয়া

হয়েছে। এতে কর্তৃপক্ষের সাফাইকর্মীর পয়সা খানিকটা নিশ্চয়ই সাশ্রয় হচ্ছে। কিন্তু এতে তিয়াষের একটা সুবিধে হয়েছে। জয়িতা তার সেল পরিষ্কার করতে আসে, আর তারা নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝেই অনেক প্ল্যানও কষে নেয়। স্পন্দনের জন্য তিয়াষ পাঠায় অনেক বার্তা,

- সবচেয়ে আগে এখানকার লোকেদের খাবারের সঙ্গে মেশানো নেশা বা ঘুমের ওষুধের পরিমাণ কমাতে হবে বা বন্ধ করতে হবে। যতক্ষণ এটা না হচ্ছে আমরা এখানকার কারও সঙ্গে সুস্থভাবে কোনো কথা বলতে পারব না। আর একজোট না হলে এই শক্ত পাহারা ভাঙা অসম্ভব।

- তিয়াষ, তোমার সত্যিই মনে হয় যে এটা সম্ভব? আমরা মুক্ত হব?

- হ্যাঁ, আমি স্বপ্ন দেখি। আমাদের সংখ্যার তুলনায় এই পাহারাদার, মিস বাসুর সংখ্যা নগণ্য। এরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না, যদি আমরা একবার আপার হ্যান্ড নিতে পারি। আর সেটার জন্য আমাদের ঘুমের ঢুলুনি থেকে বেরোতে হবে।

জয়িতা মাথা নেড়ে চলে যায়। সেদিন রাতেই স্পন্দনকে এর একটা ব্যবস্থা করতে বলে জয়িতা।

স্পন্দন বাইরে থেকে যে কাজটা শুরু করেছিল তার মধ্যে প্রধান ছিল এখানকার কর্মচারীদের মধ্যে গুনে গুনে কিছু লোককে হাত করা। তার মধ্যে নতুন টহলদার গৌতমকে হাত করা। গৌতমের নিজেরও এই চোরাই-গুপ্তাই কাজে থাকার ইচ্ছে কম ছিল। তারপর স্পন্দন থেকেও সে যখন জানতে পারল যে ভেতরে আসলে কী হচ্ছে সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল,

- না বাবু, আমাদের মা-বোনেদের ইজ্জত নিয়ে ব্যাবসা করতে আমরা দেব না। আপনি বলুন, আমরা সব সাহায্য করব। দরকারে লোক দেব।

- আপাতত অফ আওয়ারে আমাকে ভেতরে ঢোকার একটা ব্যবস্থা করে দাও।

গৌতম সেইমতো ব্যবস্থা করেছিল। কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। স্পন্দন অন্যান্য সাধারণ ষন্ডার মতো ইউনিফর্ম পরে ভেতরে ঢুকে পড়ে ফ্যাক্টরির পেছনদিক দিয়ে। আর এই প্রথম এই বিশালাকার ফ্যাক্টরির স্বরূপ দেখে চমকিত হয়। মনে মনে ভাবে, একই কারখানা যদি গোরুর দুধের জন্য হত, কত মানুষ উপকৃত হত!

ফ্যাক্টরির সবচেয়ে শেষ তলায়, মানে দশ তলায় কিচেন। সেখানে পৌঁছে গেছিল স্পন্দন। আর ঢুকে দেখেছিল কতটা হাইজিন মেনে রান্নাবান্না হচ্ছে। এদিক দিয়ে মিস বাসু কোনো চান্স নেননি। বন্দিদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সত্যিই দারুণ। শুধু একটা জিনিস চোখে পড়ল স্পন্দনের। লাল রঙের কোনো একটা পদার্থ সব খাবারের মধ্যেই দেওয়া হচ্ছে। পাউডারের মতো দেখতে, কিন্তু লঙ্কার গুঁড়ো নয় এ জিনিস। এ জিনিসের জন্যেই যে বন্দিদের সবার ঘুম পায় তা সহজেই অনুমান করতে পারে স্পন্দন। এ পদার্থ খাদ্যে মেশানো আটকাতে হবে।

একজন পাচককে অনুসরণ করে স্পন্দন দেখে নেয় ঠিক কোথায় মজুত করা হয় এই লাল পাউডার। আগামী ছ'মাসের মজুত রয়েছে গুদামে। কিছু ছবি তুলে নেয় সে মোবাইলের ক্যামেরায়। একটা প্যাকেট থেকে অল্প কিছুটা ঢেলে নেয় পকেটে। স্পন্দন বুঝতে পারে যে খরচ বেড়ে গেল। স্পন্দন বেরিয়ে পড়ে সেদিন ফ্যাক্টরি থেকে।

গৌতমের সঙ্গে বসে একটা প্ল্যান বানায়। আগামী কিছুদিনের মধ্যে ওইরকম লাল রঙের ফুড কালার পাউডার আনানো হয়। সে পাউডার এডিবল ছিল। মানুষ খাবারের সঙ্গে খেলে কিছু হবে না। একজন ফুড ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য নেয় তারা। স্পন্দনের আনা পাউডার টেস্ট করে প্রায় হুবহু একই স্বাদের পাউডার মিক্স বানানো হয়। পাউডারের প্যাকেটে ছাপানো হয় একইরকম লেবেল। যে গুদামে রাখা ছিল সেই নেশার লাল পাউডার, সেখানের জন্যে এরকম শতাধিক প্যাকেট এবং বস্তা তৈরি করা হয়। এবার আসল কাজ। কীভাবে আসল নেশার লাল পাউডারকে পরিবর্তিত হয়ে আসবে নকল এডিবল লাল ফুড পাউডার?

ফ্যাক্টরির রাতের অন্ধকারের সুবিধে নেয় গৌতম। ফ্যাক্টরির পেছনে এসে ডাঁই করা হয় সেই বানানো লাল পাউডার। যেদিকটায় জমানো হয় সেদিকটায় টহল থাকে না। পেছনে জলা-জঙ্গল। স্পন্দনদের সেখান অব্দি এত এত প্যাকেট, বস্তা বোঝাই করে আনতে অসুবিধে হয় ঠিকই, কিন্তু এদিকে পাহারা না থাকায় ফ্যাক্টরির পেছনে স্টোর করতে অসুবিধে হল না। কেউ জানতেও পারল না গোকুলে কে বড়ো হচ্ছে।

এর পরের দিন গৌতম বেশ কিছু নগদ খসিয়ে হাত করে নিল গুদামঘরের দায়িত্বশীল এক কর্মচারীকে। ফায়ার অ্যালার্ম বাজিয়ে আসল লাল পাউডার গুদাম থেকে বের করে নিচে রাখাই ছিল ওই কর্মচারীর কাজ।

সময়মতো ফায়ার অ্যালার্ম বাজল এবং অতি দ্রুততার সঙ্গে গুদামের সমস্ত আসল লাল পাউডার এসে জমা হল নিচের তলায়। কর্তৃপক্ষ এই পাউডার নিয়ে রিস্ক নিতে চায় না, কারণ ব্যাবসার একটা বড়ো সাফল্য নির্ভর করে আছে এই পাউডারে। এতে কী মেশানো থাকে তা খোদায় মালুম!

ওই কর্মচারী নিজে পাউডারের দায়িত্বে থেকে ওপরে গুদামে ফায়ারের সমস্ত উপকরণ চেক করতে পাঠিয়ে দেয় বাকিদের। আধ ঘণ্টা পর যখন তারা ফেরত এসে জানায় যে ফলস অ্যালার্ম ছিল ততক্ষণে গৌতম এবং স্পন্দনের গোটা দশেক লোক মিলে আসল লাল পাউডার সরিয়ে নকল লাল পাউডার রেখে গেছে গুদামে। এক-আধজনের সন্দেহ হয় ঠিকই, কিন্তু এরকম ফলস অ্যালার্ম আগেও বেজেছে বিভিন্ন সময়। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা মিস বাসুর কানে পৌঁছয় না।

জয়িতার মারফত তিয়াষ যখন খবরটা পায় তখন তার মুখে ফুটে উঠে স্নিগ্ধ হাসি। সে যেন মিস বাসুর পতন দেখতে পাচ্ছে এখন থেকেই।

সেদিন রাতেই কিন্তু তিয়াষের এই সুখ-ভাবনায় প্রবল ধাক্কা লাগে। মিস বাসু আজ আবার হাজির হয়েছেন। এবার সেই দুটি মেয়ের ডেলিভারির সময় আগত।

এই রাতের বেলায় মিস বাসুর আগমন হলেই ভয়ে কেন্নো হয়ে পড়ে সব বন্দি। শুরু হয় জোকার, মুখ দিয়ে বিচ্ছিরি রকমের চটক। চাপা কান্না, গোঙানি আর বৃথা আস্ফালন হয়ে বেরোতে থাকে সবার মুখ থেকে। শব্দ ধাক্কা খায় ফ্যাক্টরির মেশিন থেকে মেশিনে, দেয়ালে দেয়ালে শোনা যায় অনুরণন। এটাই এখানকার রোজকার রাত্রিযাপন।

মিস বাসুর আদেশে ডেলিভারির সেলে হাজির করা হয় মেয়েদুটিকে। আজ সেখানে দুটো আলাদা বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মিস বাসু দু'জনকে আলাদাভাবে পরীক্ষা করে দেখে নেন।

- বেশ, তবে একজন নর্মাল, অন্যজনের সিজার।

তিয়াষের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠে। এই পূতিগন্ধময় এলাকায় একজনের সিজার? তা'ও ওপেন ফোরামে? মেয়েটির জন্যে কান্না পায় তার।

প্রথমে নর্মাল ডেলিভারি। এতক্ষণে যে বীভৎস শব্দ হচ্ছিল তা এখন বন্ধ। আবার ফলাফলের অপেক্ষা। শুধু শোনা যাচ্ছে মেয়েটি চিৎকার। সে আর প্রেশার দিতে পারছে না। মেয়েটির হাতে-পা শক্ত

করে ধরে আছে মিস বাসুর অ্যাসিস্ট্যান্টরা। এক-একটার চেহারা দেখলেই পেটের ভাত উগরে আসে।

এক সময় মেয়েটির চিৎকার সপ্তমে চড়ে, পরক্ষণেই বাচ্চার কান্না শুনতে পাওয়া যায়। নাড়ি ছিঁড়ে তাতে ক্লিপ আটকে অ্যাসিস্ট্যান্টকে সে বাচ্চা তুলে দেন মিস বাসু। তারপর তিনি চলে গেলেন পরের অপারেশন টেবিলে।

একজন অ্যানাস্থেটিস্ট যখন দ্বিতীয় মেয়েটির মেরুদণ্ডে ইনজেকশন দিচ্ছে, ততক্ষণে বাচ্চাটিকে আলোর সামনে ধরা হয়ে গেছে। সবাই দেখতে পেল এ আর এক শিশুপুত্র, সে কাঁদছে এত আলো দেখে কিম্বা হয়তো বাল্‌বের উত্তাপে। কারাগার থেকে হাতগুলো বেরিয়ে এল, সঙ্গে এল ছটফটানি, শব্দ, হুংকার, কান্না। বিবমিষার উদ্রেক হল তিয়াষের মনে। বমি করতে লাগল সে তার বিছানায় শুয়ে শুয়েই।

মিস বাসু মেয়েটির কোমরের নিচ অব্দি অবশ হবার অপেক্ষা করলেন। বাইরে হয়ে চলা কোলাহল যেন তাঁর কানেই আসছে না। তিনি অপেক্ষা করছেন শুধু এত পরিশ্রমের পর পেতে চলা একটি কন্যাসন্তানের জন্য। তার জন্যেই এতশত আয়োজন।

মেয়েটির তলপেটে ছুরি চালালেন তিনি। আর কিছু সময়ের ব্যবধানে তার হাতে এল আর এক সবুজ প্রাণ। রক্ত মুছে সেই প্রাণকে ভালোভাবে দেখে নিলেন তিনি। তারপর নিজেই এগিয়ে এলেন আলোর সামনে। তার মুখ দেখে এতক্ষণ আওয়াজ করতে থাকা বন্দিরা হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। তাহলে কি আজ দু-দুটো প্রাণ...

মিস বাসু মুখে হাসি নিয়ে অনাবৃত শিশুকে এগিয়ে দিলেন বন্দিদের দিকে। বন্দিদের চোখ নরম হয়ে এল। কন্যাসন্তান, কন্যাসন্তান— এই ফ্যাক্টরি যা চায়, সেই কন্যাসন্তান! পরক্ষণেই সেই নরম চোখ ভেঙে জল এল।

একটা প্রাণ মিস বাসু হাসিমুখে মাথার ওপর তুলে রেখেছেন, অপর প্রাণ গরম জলে তলিয়ে যাচ্ছে। কোনো এক অমানুষ বাচ্চাটার ছোটো একটা পা ধরে রেখেছে দেখা যাচ্ছে, বাকি শরীর ফুটন্ত গরম জলের ভেতরে চালান করা হয়ে গেছে। পা'টাও একসময় হাত থেকে ফসকে ডুবে গেল অতলে।

তিয়াষ এখন পূর্ণগর্ভা। তার দেখভাল বাড়িয়ে দিয়েছেন মিস বাসু। প্রতি সপ্তাহে একবার সোনোগ্রাফিতে বাচ্চার অবস্থান দেখে নিতে চাইছে কর্তৃপক্ষ। তিয়াষের হাটতে এখন অসুবিধে হয়। ওয়াশরুমে যেতে সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

সেদিন রাতের পর তিয়াষ আরও চুপ হয়ে গেছে। শুধু মিস বাসুর সাম্রাজ্য ধ্বংস নিয়ে কথা বলতেই ভালোবাসে। জয়িতা এলে এসব নিয়েই কথা বলে সে। সেদিন রাতে এক শুধু বাচ্চাটিকে মেরে ফেলেননি মিস বাসু, যে কন্যাসন্তান জন্ম দিয়েছিল সেই মেয়েটিও অযত্নে মারা যায়। এই জায়গায় যে সিজারিয়ান বেবি সম্ভব নয় সেটা জানাই ছিল। শুধুমাত্র নিজের জেদের বসে দু-দুটো প্রাণকে শেষ করেছে সে। যে মায়ের সন্তান জীবিত, সে মা বেঁচে নেই, আর যে মায়ের সন্তানকে খুন করা হয়েছে সেই মা বেঁচে আছে— এই বাঁচার কী অর্থ!

বান্ধবীর কন্যাসন্তানকে আগলেই যেন বেঁচে আছে মেয়েটি।

রোজ প্রায় এসব দেখে দেখে আর স্বাভাবিক থাকা যাচ্ছে না। ভেতর থেকে মুষড়ে পড়ে নতুন সবুজ প্রাণের জন্ম দেওয়া কতটা কষ্টকর, তা যে এরকম অবস্থার মধ্যে পড়েছে একমাত্র সে'ই জানে। তবে একটা ভালো খবর ছিল, রোজ রোজ খাবারের সঙ্গে আর ওষুধ ভেতরে না যাওয়ায় স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি অনেকেই ফিরে পেয়েছে। সবাই ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। প্রতিবাদ আর গোঙানিতে আটকে নেই।

মাঝে মাঝেই দেখা যায়, কর্মীদের অসভ্য আচরণের সামনে কেউ না কেউ রুখে দাঁড়াচ্ছে। তাকে সমর্থন করছে অন্য অনেকে। মেরুদণ্ডে আবার জোর আসছে। মিস বাসুকেও ডেলিভারিতে এসে গালাগাল শুনতে হচ্ছে, যেটা একসময় ছিল স্বপ্নের অতীত। কিন্তু এখনও কর্তৃপক্ষ বুঝে উঠতে পারেনি কেন এরকম হচ্ছে। ইতোমধ্যে মুক্তির স্বাদ যে আসতে চলেছে সে বিষয়েও বন্দিদের জানানো শুরু হয়ে গেছে। সবাইকে তৈরি থাকতে বলা আছে। সবাই এখন কথা বুঝতে পারে, তারাও মুক্তির জন্যে এখন আকুল।

এরই মধ্যে একদিন জয়িতা এসে তিয়াষকে জানায়,

- স্পন্দন বলেছে যদি শেষ করতে হয় সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। নইলে নিজেরা মুক্ত হলেও আবার এরা ব্যাবসা শুরু করবেই।

- তা ঠিক। কিন্তু কীভাবে? কিছু বলেছে?

- তোমার প্রবাবল ডেলিভারি ডেটের সময় ফ্যাক্টরির মধ্যে একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এসকর্ট কোম্পানির সঙ্গে 'মা' ব্র্যান্ডের টাই-আপের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি হিসেবে। কনফিডেনশিয়াল অনুষ্ঠান হবে। কিন্তু এতে সুবিধে এই যে সংগঠনের মূল মাথা মিস বাসু ছাড়াও অন্যান্য ইনভেস্টররাও সবাই নিমন্ত্রিত থাকবে। সবাইকে একযোগে পাওয়া যাবে।

- আইডিয়া ভালো। প্ল্যান কিছু বলেছে?

- না। সময় এগোলে সব বলে দেবে বলল।

দু'সপ্তাহ পর তিয়াষের ডেলিভারির ডেট ঠিক হল। এরই মধ্যে বাইরে অনুষ্ঠানের আয়োজন চলতে থাকল।

এই অন্ধকার কয়েদখানাতে থেকেও বোঝা যাচ্ছিল বাইরে বেশ সাজো সাজো রব। যদিও সেজন্য কাজে কোনো ফাঁকি নেই। দু'বেলা বন্দিদের বুকের বোতাম খুলতেই হচ্ছে।

স্পন্দন শুধু চেষ্টা করে যাচ্ছে যেন প্ল্যান ফুলপ্রুফ হয়। শুধু 'মা' বন্ধ করাই নয়, যেন প্রত্যেক বন্দিনী নিজের ঘরে ফিরতে পারে সেজন্যে প্রয়োজনীয় মিডিয়া ব্যাক-আপ তৈরি করে রাখল সে। তিয়াষের ইচ্ছেই হল সবাই একসঙ্গে মুক্তি পাবে, সে ইচ্ছে পূরণে সচেষ্ট স্পন্দন।

তিন দিনের অনুষ্ঠান হবে। ইচ্ছে করেই এই তিন দিনের ব্যবস্থা করল স্পন্দন, যেন একদিন আগে-পরে ইমার্জেন্সি ডেলিভারি করাতে হলেও যেন অসুবিধে না হয়। তিনদিনই 'মা' ব্র্যান্ডের সমস্ত কর্তাব্যক্তিদের উপস্থিত থাকার কথা। মূল কান্ডারি ওই মহিলা ডাক্তার মিস বাসু, যিনি নিজেই সমস্ত বন্দিদের ডেলিভারি এবং কেনাবেচা সামলান, সঙ্গে ওই স্টোরেজের ম্যানেজার যে তিয়াষ আর জয়ের গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটিয়েছিল। ইনভেস্টর এল আরও কয়ে কজন। এই ছোট্ট টিম নিয়ে এত সুপরিকল্পিতভাবে বেআইনি 'মা' ব্র্যান্ড চালানো সত্যিই মুখের কথা নয়। সোর্সিং মজবুত বলেই হয়তো এতদিন টিকিয়ে সাফল্যের মুখ দেখেছে এরা। আর মিস বাসু ছাড়া সবাই পুরুষ। একা একজন মহিলা ঠিক কতটা জাঁদরেল হলে এরকম কিছু সামলানো যায় সেটা ভেবেই অবাক হচ্ছে গৌতম থেকে স্পন্দন সবাই। তবে স্পন্দনের অবাক হওয়াটা বোঝা যায় না। সারাদিন কী যেন ভাবতে থাকে! হয়তো সমস্ত পরিকল্পনা নিয়েই চিন্তা তার।

অনুষ্ঠান যথাসময়ে শুরু হল। প্রথম দিন তিয়াষের প্রসব বেদনা উঠল না। দ্বিতীয় দিন সন্ধে পেরোল না, তিয়াষের গোঙানি শুরু হল। ওয়াটার ব্যাগ ভেঙে গেছে। শুরু হল তোড়জোড়।

স্পন্দনের প্ল্যানমাফিক সবাইকে সবকিছু আগেই বলা ছিল। শুধু ভয় একটাই ছিল। সঠিক সময়ে এই সেলের বন্দিরা গর্জে উঠবে কি না। কারণ তারা প্রত্যেকেই কমবেশি ভেতর থেকে মরে ছিল এতদিন। স্পন্দন তার অন্যান্য সব কলিগদের মাধ্যমে প্রতি ফ্লোরের প্রতি সেলে খবর পৌঁছে দিয়েছে। কার কী কী কাজ হতে পারে, কোথায় কোথায় অস্ত্রশস্ত্র মজুত রাখা হবে সব আগেই জানানো হয়ে গেছে।

বাইরে এখন জলসা চলছে। নাচগান, দেদার খানাপিনা। কিন্তু সেখান থেকে মিস বাসু এবং তিনজন লোক ছুটে গেল ভেতরে। সবাই গ্রাউন্ড ফ্লোরের সেলগুলোর দিকে ছুটল। স্পন্দন বুঝে গেল এই সংকেতের অর্থ।

এসকর্টের কাজ করতে করতে তারই মতো 'মা' ব্র্যান্ডের চক্রে আটকে পড়া বেশ কিছু যুবককে একত্রিত করতে পেরেছিল স্পন্দন। তারাও চাইছিল এই চক্রের থেকে মুক্তি। এরাই বিভিন্ন ফ্লোরে নিজের নিজের শয্যাসঙ্গিনী মারফত খবর পৌঁছে দিয়েছিল। এই টিমটাকে তৈরি থাকতে ইঙ্গিত করল স্পন্দন।

ওইদিকে হলঘরে সেই পরিচিত দৃশ্য। বিছানা থেকে তিয়াষকে তুলে আনা হচ্ছে ছোট্ট সেলটিতে। সব বন্দিনীরা বীভৎস শব্দে নিজের আর্তি জানাচ্ছে। মিস বাসু এবং তিনজন লোক জানতেও পারছে না কখন কয়েদিদের সেলের তালা ভাঙা হয়ে গেছে। গতকাল মোচ্ছবের সুযোগে মিস বাসুর সাম্রাজ্যে যে বড়োসড়ো ফাটল ধরেছে তা ঘুণাক্ষরেও জানেন না মিস বাসু।

কিন্তু চিন্তার বিষয় কেউ সেলের বাইরে পা'ও বাড়াচ্ছে না। রোজকার মতো নিজের জায়গায় বসে আর্তনাদ করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিয়াষের চিৎকার মাত্রা ছাড়ায়। একজন শক্তভাবে তার হাতদুটো চেপে ধরেছে। দু'জন ধরেছে তার পা। সে আর পুশ করতে পারছে না। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। জোরে একবার চিৎকার করে বালিশে মাথা ফেলে দেয় সে। এবার একটা আশ্চর্য জিনিস ঘটে যায়। বন্দিনীরা সবাই নিজের জায়গা থেকে উঠে দাঁড়ায়।

সারিবদ্ধ হয়ে লোহার রডের দিকে এগিয়ে আসে। একজন জোরে মুখ দিয়ে শ্বাস ফেলে। শব্দ হয়,

- হু!

পরের বার আরও কয়েক জন যোগ দেয়। শুরু হয় এক রাজকীয় 'হু'- কার!

সবাই একযোগে সেই শব্দ করতে থাকে। একটা ভাইব্রেশন ছড়িয়ে পড়ে হলঘরের মধ্যে। হাজার হাজার বন্দিনীর হুংকারে কখন তিয়াষ সর্বশক্তি জড়ো করে শেষ চেষ্টা করে এবং সাকশান কাপের টানে বাচ্চা পৃথিবীর বুকে কখন চলে আসে মিস বাসু ছাড়া কেউ বুঝতেই পারে না।

রক্তাক্ত শরীরটাকে কর্ড ছিঁড়ে ক্লিপ আটকে আলোর সামনে যখন তুলে ধরেন মিস বাসু তখন সবাই বুঝতে পারে, এ এক রাজপুত্র। অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকটার মুখে পৈশাচিক হাসি ফিরে আসে। সে জানে এতদিন ধরে যে কাজটি সে করেছে আজকেও সে সেই কাজটি আবার করবে। ড্রামে গরম জল তখন ফুটছে।

আজ বন্দিনীরা একটু বেশিই হুংকার দিচ্ছিল বলে আজ লোকটাকেও একটু বেশিই কৌতুক পেয়ে বসেছে। সে মিস বাসুর হাত থেকে বাচ্চাটাকে প্রায় ছিনিয়ে সেলের সামনে নিয়ে আসে। সবাইকে দেখাতে থাকে কাছে গিয়ে গিয়ে। আর মুখে বলতে থাকে,

- এটাকেও শেষ করে দেব! কন্যাসন্তান দিতে হবে তোদের, আমরা ব্যাবসা করব তোদের সন্তানের দুধ বিক্রি করে!

আর থাকতে পারে না বন্দিনীরা। তাদের একজন লাথি দিয়ে সেলের গেট খুলে ফেলে। তালা খোলাই ছিল। গেট গিয়ে অন্যপ্রান্তে ধাক্কা লেগে ধাতব ঝংকারের শব্দ ফেটে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একে একে খুলে যায় অন্যান্য সব গেট। লোকটা হঠাৎ নিজেকে জনসমুদ্রের মধ্যে আবিষ্কার করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সমুদ্রে তলিয়ে যায়।

অকস্মাৎ এই বিপর্যয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন মিস বাসু এবং তার বাকি দুই শাগরেদ। তিয়াষের দিকে একবার তাকান মিস বাসু। ওই অবস্থাতেও তিয়াষ বলে,

- বলেছিলাম না ডক্টর বাসু, এ পাপের একটাই শাস্তি— মৃত্যু!

ধীরে ধীরে জনসমুদ্র এগিয়ে আসে মিস বাসু এবং বাকি দু'জনের দিকে। সমুদ্রের ঢেউ গত দুই বছরের প্রত্যেকটা দিনের অত্যাচারের

প্রতিশোধ নিয়ে নেয়। জনসমুদ্রে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় মিস বাসু সহ বাকি তিনটি শরীর। হলঘর থেকে এই জনসমুদ্র একে একে ধ্বংস করতে থাকে মেশিনঘর থেকে শুরু করে ফ্যাক্টরির যাবতীয় সমস্ত সরঞ্জাম। বিভিন্ন জায়গায় লুকোনো ছিল কাঠ, হকির স্টিক, দা, শাবল। সব একে একে হাতে চলে আসে বন্দিনীদের। প্রতি ফ্লোরে এরকমই এক জনসমুদ্র যেন উথলে উঠেছে। কর্মীদের বেশিরভাগই মোচ্ছবে ছিল। যারা ওপরে কাজ করছিল, তারা এতদিন ধরে বন্দিনীদের ওপর করে চলা নিপীড়নের সঠিক শাস্তি পেতে থাকে। বাঁধভাঙা জলোচ্ছ্বাসের মতো এগোতে থাকে ময়লা পোশাকে আবৃত বন্দিনীরা।

বাইরে তখনও জলসা চলছে। মদমত্ত অবস্থায় রয়েছে স্টোরেজ ম্যানেজার সহ বাকি সবাই। একমাত্র সিসিটিভি রুমের লোকেরাই দৌড়ে আসছিল। স্পন্দন এবং তার কলিগদের তৎপরতায় সে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। বাইরে থেকে গৌতম আটকে দেয় ফ্যাক্টরির গেট, শাটার পাহারা দিচ্ছে এসকর্টদের একাংশ। বাইরে থেকে অন্যান্য গার্ডরা ভেতরে ঢুকতে পারে না। ইতোমধ্যে স্পন্দনের তৎপরতায় পুলিশ চলে এসেছে।

ভেতরে ম্যানেজার সহ যারা ছিল, তারাও বন্দিনীদের রোষে পড়ল। স্পন্দন সহ তার টিমের সবাই বাকিদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে এদের ছেড়ে দেওয়া হোক, পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হোক। কিন্তু কেউ তখন সেটা শোনার অবস্থায় ছিল না। অতএব এক সময় স্পন্দনরা সরে দাঁড়ায়।

যতক্ষণে পুলিশ ভেতরে এসে পৌঁছয় ততক্ষণে 'মা' ব্র্যান্ডের সর্বস্ব ধ্বংস হয়ে গেছে। পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে চলে সহস্রাধিক বন্দিনীকে। উদ্ধার করা হয়েছিল সেইসব সদ্যোজাত কিম্বা বছর খানেক বড়ো কন্যাসন্তানদেরও যাদের দিয়ে ভবিষ্যতের ব্যাবসা সুগম করতে চেয়েছিল 'মা' ব্র্যান্ড। তাদের দেখাশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্বও নিয়েছিল প্রশাসন। বন্দিনীদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং মিডিয়া পরবর্তীতে চেষ্টা করে তাদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার।

কিন্তু ততক্ষণে আর একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে।

সবাই তিয়াষকে ওই অবস্থায় অপারেশন টেবিলেই ফেলে রেখে চলে এসেছিল। যখন স্টোরেজ ম্যানেজার সহ বাকি সবাইকে বন্দিরা পাপের প্রায়শ্চিত্তের কোনো সুযোগ দিতে নারাজ, তখন স্রোতের

উলটোদিকে স্পন্দন প্রাণপণে ছুটেছিল। বাচ্চাটা জয়িতা আগেই কোলে নিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু এত হুলুস্থুলের মধ্যে তিয়াষের কাছে কেউ পৌঁছতে পারেনি।

একসময় স্পন্দন পৌঁছেছিল। ততক্ষণে প্রচুর রক্তক্ষরণ ঘটে গেছে। তিয়াষকে প্রাণপণে ডেকেছিল স্পন্দন।

- তিয়াষ, চোখ খোলো! চোখ খোলো, তিয়াষ! তুমি যা যা চেয়েছিলে সব করেছি! সবাই আজ মুক্ত। আমি তুমি এবার আমাদের স্বপ্নের সংসার সাজাতে পারব। প্লিজ! প্লিজ তিয়াষ!

চোখের জল তিয়াষের গালে পড়ছিল, কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করছিল স্পন্দন।

- একটিবার চোখ খোলো না! একবার!

সে চোখ তিয়াষ আর খোলেনি। সবাইকে মুক্তি দিয়ে নিজেও অন্য এক মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল সেদিন তিয়াষ।

***

সেই রাতের পর সাত বছর কেটে গেছে। স্পন্দন এখন একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করে। তিয়াষের পরিবার স্পন্দনকে ভালোভাবেই মেনে নিয়েছিল। জয়কে সেদিন রাতের দুর্ঘটনার পর ওরা মেরে ফেলেনি। হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছিল। জয় এখন তিয়াষের পরিবারের এবং স্পন্দনের ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু।

সেদিনের শত-হাজার বন্দিনীর সবাই এখন সুস্থ জীবন কাটাচ্ছে। ভালোই আছে তারা। কেউ ঘরে ফিরতে পেরেছে, কেউ নিজের মতো করে নতুন জীবন কাটাচ্ছে।

অরিজিৎ এখন ক্লাস ওয়ানে পড়ে। তিয়াষ আর স্পন্দনের ছেলে। কোনোকিছুর অভাব হতে দেয়নি তার বাবা, ঠাম্মা-ঠাকুরদা। এমনকি জয়কাকাও সবসময় তার খেয়াল রাখে।

শুধু একটাই অভাব হওয়ার কথা ছিল— মায়ের দুধ।

কিন্তু তার এক মা সেদিন রাতে তার জন্য হাজার পয়স্বিনী মায়ের সৃজন করেছিল। মাতৃদুগ্ধের অভাব অরিজিতের একদিনের জন্যেও হয়নি।

মামলার শেষে
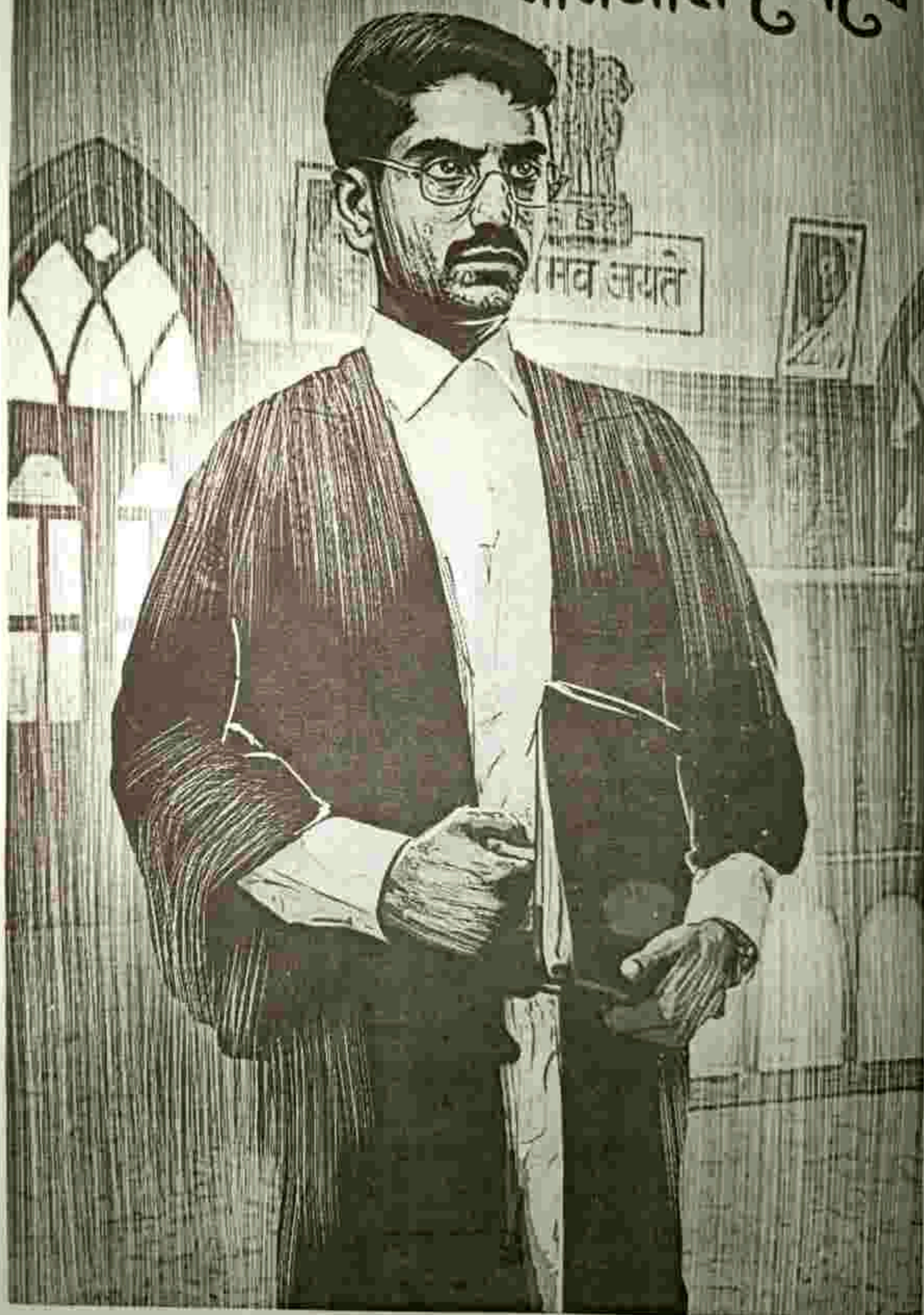
মুহুরি টাইপ শেষে প্রায় একদিস্তা কাগজ সামনে এগিয়ে দিল। দু'জন লোক এগিয়ে এসে কাগজের দিস্তাটা মুহুরির হাত থেকে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। মুহুরির বিল মিটিয়ে সামনের চায়ের দোকানে এগিয়ে গেল তারা।

- দুটো চা দাও। হ্যাঁ তো তুমি কী বলছিলে?

- দাদা, এরকম জিনিস আমাদের ভারতীয় আদালত আগে কখনও দেখেনি। তাই বলছিলাম কী...

- না, না। আর কিছু বলার দরকার নেই। যা কিছু কথাবার্তা, সব ওখানেই হবে। রিস্ক নিলাম উর্দু রিস্প-এর জন্য। না হলে এবার না খেয়ে পথে বসার সময় এসেছে আমার।

- রিস্প মানে তো খাবার, বাব্বা উর্দু! আচ্ছা। আর লাইসেন্স যাবার ভয় নেই?

সামনের লোকটা এবার মুচকি হেসে গ্লাসের চা একটানে শেষ করল। বিল মেটাল অন্যজন।

***

সকাল হতেই আদালত চত্বরে ব্যস্ততা। শহরে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ক্রাইম হচ্ছে মিসেস রাস্তোগি হত্যার মামলা। ঘটনা ঘটেছে অনেকদিন। কিন্তু এখনও খবরটা প্রথম পাতাতেই রয়ে গেছে। কারণটা ভাইরাল হয়ে যাওয়া এক ভিডিয়ো। যেখানে মি. রাস্তোগি তাঁদের বিবাহবার্ষিকীর দিন ফেসবুক লাইভে এসে জানান তাঁর গিন্নির জন্য তিনি একটি সোনার নেকলেস উপহার এনেছেন এবং সেই উপহার নিয়ে তিনি তাঁর বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। লিফট দিয়ে উঠে তিনি নিজের ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেখলেন দরজা আগে থেকেই খোলা। কিছুটা হতভম্ব হলেন মি. রাস্তোগি এবং লাইভে এসব দেখে চলা বাকি দর্শক। আস্তে আস্তে তিনি ভেতরে ঢুকলেন এবং পরিপাটিভাবে সাজানো একটি ঘর আবিষ্কার করলেন। ঘরের সাজসজ্জা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল মিসেস রাস্তোগি তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিবাহবার্ষিকী উপভোগ করার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু তিনি কোথায়? দু-একবার মি. রাস্তোগি গিন্নির নাম ধরেও ডাকলেন। কিন্তু যা হয়, এরকম সময়ে উত্তর খুব কমই পাওয়া যায়। থ্রি বি এইচ

কে-র মাস্টার বেডরুমে পাওয়া গেল মিসেস রাস্তোগির নিথর দেহ। ঘটনার সাক্ষী থাকল প্রায় পুরো সোশ্যাল মিডিয়া। বডি পাওয়ার পর যতটা কান্নায় মি. রাস্তোগি ভেঙে পড়লেন, তাঁর দ্বিগুণ বেগে ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ল বাজারে।

অচিরেই পুলিশ তদন্ত শুরু করল এবং বেসিক কিছু তথ্যের ও অভিযোগের ভিত্তিতে মি. রাস্তোগিকেই গ্রেপ্তার করল। কিন্তু আদালতে দিন যত গড়াল তত মি. রাস্তোগি ও অ্যাপার্টমেন্টের প্রায় সবার বক্তব্যে মিসেস রাস্তোগির এক গুপ্ত প্রেমিকের কথা সামনে এল। মিসেস রাস্তোগির এই অ্যাফেয়ারের কথা সবাই জানতে তো পেরেছিল, কিন্তু সেই প্রেমিকের সন্ধান পুলিশ লাগাতে পারল না। চেহারার যা বৃত্তান্ত পুলিশের কাছে এল তাতে গোটা শহর চিরুনি-তল্লাশি করেও সেই ব্যক্তির সন্ধান কেউ দিতে পারল না এবং যা প্রমাণাদি পরবর্তী সময়ে হাতে এল তাতে এটা পরিষ্কার হল যে সেদিন মি. রাস্তোগি ফ্ল্যাটে আসার আগেই মিসেস রাস্তোগি খুন হয়েছেন। রাস্তোগিসাহেব জামিন তো পেলেন কিন্তু আদালতে শুধু তারিখ বাড়তে লাগল। আসল অপরাধীর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না।

যখন আদালতে শুনানি হত, তখন জনতার ভিড়ে এক তরুণ উকিলকে বসে থাকতে দেখা যেত। নাম ইলিয়াস মোহম্মদ। সব বড়ো মামলার ঠেকেই তার উজ্জ্বল উপস্থিতি। অথচ নিজের রোজগার প্রায় নেই বললেই চলে। ছোটোখাটো কাগজ বানানো আর খদ্দের জোগাড় করে বড়ো উকিলের সাথে মিটিং করিয়ে দেওয়া অব্দিই তাঁর দৌড়। বন্ধুরা মজা করে বলত, ইলিয়াস ওকালতি পাশ করেই ক্রাইমটা করে ফেলেছে। এখন শুধু যাবজ্জীবন কাটাচ্ছে।

এরকম আরও আরও অপমান। অবশ্য ইদানীং ইলিয়াসের গায়ে সয়ে গেছিল সব। সে শুধু অপেক্ষা করত এরকম কোনো কেসের যা আর পাঁচটা কেস থেকে আলাদা হবে। আদালতে বিচার হবে অন্য পদ্ধতিতে। ক্রাইম হবে সবচেয়ে ইউনিক। লোকে ইলিয়াসের মুখে এসব শুনত আর খুব হাসত। ঠিক যেমন সেদিন বন্ধু-উকিলরা হেসে গড়িয়ে পড়েছিল যখন ইলিয়াস বলল,

- নাহ্। এ কেস আলাদা। যদি আমার বেসিক ইনস্টিংক্ট সঠিক হয় তবে...

এক বন্ধু বলে উঠেছিল,

- তবে ঘোড়ার ডিম!

- এ কেস আমি নিচ্ছি। আজই কথা বলব। পিটিশন করব। এ'ই সেই কেস যার জন্য না খেয়ে না পরে আদালতে এতদিন কাটিয়েছি।

বলা বাহুল্য ইলিয়াস চলে যেতেই অন্যান্য উকিলরা ইলিয়াসের ব্যক্তিগত কেচ্ছা থেকে পাগলামি সবকিছু নিয়ে জলসার আয়োজন করেছিল। কিন্তু ওদের মুখটাই ফ্রিজ থেকে বের করা শুকনো রুটির মতো হয়ে গেছিল যখন ওরা দিন পনেরো পর শুনল ইলিয়াস সরকারি তরফে মিসেস রাস্তোগি কেসের দায়িত্ব পেয়েছে।

আজ সেই কেসের শুনানির প্রথম দিন। জজসাহেব এজলাসে আসতেই সবাই উঠে দাঁড়াল। জজসাহেব তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র ভালোভাবে দেখলেন। তারপর বললেন,

- আজ মিসেস রাস্তোগি হত্যা মামলা রিওপেন হচ্ছে। সরকারি তরফে পুনরায় মি. রাস্তোগির নামে অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু এবার তিনি নিজের মামলা নিজেই লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকারি তরফে উকিল থাকছেন মি. ইলিয়াস মোহম্মদ। ভারতীয় আদালতে এই মামলা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং মামলা চলাকালীন মূলত সতর্কতার জন্য জনগণের জন্য প্রবেশদ্বার বন্ধ থাকবে। এবার এজলাস শুরু হোক।

জজসাহেবের বয়ান শেষ হতেই মুহুরির নির্দেশে ইলিয়াস মোহম্মদ তার কালো কোট সমেত উঠে দাঁড়াল।

- আমি কাঠগড়ায় মূল অভিযুক্ত মি. রাস্তোগিকে আসতে অনুরোধ করব।

অল্প সময়ের মধ্যেই অভিযুক্ত কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন। ইলিয়াস এবং মি. রাস্তোগি কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন। দু'জনের দৃষ্টিতেই অপরের জন্য তীব্রতা। একজন জামিনোত্তর কাল কাটিয়ে পুনরায় কাঠগড়ায় আর অন্যজন জীবনের সবচেয়ে বড়ো বাজি খেলতে এই কেস ফাইল রিওপেন করিয়েছে।

ইলিয়াস প্রশ্ন শুরু করে,

- মি. রাস্তোগি, আমি দুঃখিত যে আপনার স্ত্রী'র হত্যা মামলায় আবার আপনাকে টানতে হয়েছে, কিন্তু আপনিও নিশ্চয় চান যে হত্যাকারীর শাস্তি হোক?

- হ্যাঁ চাই। কিন্তু আমাকেই কেন আবার অভিযুক্ত করা হল? আমি যে নির্দোষ তাঁর প্রমাণ আদালত আগেই পেয়েছিল।

এবার ইলিয়াস অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে। জজসাহেব প্রায় বিরক্ত হয়েই "অর্ডার অর্ডার" বলে চিৎকার করে উঠেন।

- সরি, মহামান্য। কিন্তু আমি মি. রাস্তোগির কথায় না হেসে পারলাম না। সেদিন যখন ঘটনাটি ঘটল একমাত্র তাঁকেই আমরা দেখতে পাই মৃতের ঘরের ভেতর। তারপর ঘরে ছিটিয়ে থাকা নানান বস্তুতে যে ফিংগারপ্রিন্ট পাওয়া যায়, তা স-অ-ব... স-অ-ব এই লোকটার। মামলার ফলাফল এখনও জানা যায়নি। তাই সরাসরি অভিযোগ করার মতো আর কোনো অপশন বাকি থাকে কি?

- কোনো অপশন নেই বলেই কি আমি?

- না না, মি. রাস্তোগি। সেজন্য নয়। আরও অনেক কারণ আছে। শুধু এইটুকু বলতে পারবেন, আপনার মতে অভিযুক্ত কে?

- আমি আদালতে আগেও বলেছি।

- হ্যাঁ, বলেছেন। কিন্তু সব খুলে বলেননি। আমরা সব জানতে চাই।

এবার মি. রাস্তোগি এবং ইলিয়াসের আবার চোখাচোখি হল। মি. রাস্তোগিকে দেখে মনে হল এরকম অনেক কথা লুকিয়ে আছে যা তিনি চান না প্রকাশ পাক।

- আমার বলার কিছুই নেই। আমার স্ত্রী পরপুরুষে আসক্ত হয়ে পড়েছিল। এই কথা আগেও বলেছি, এবারও জানালাম। এর বাইরে আমার কোনো বক্তব্য নেই।

- আচ্ছা, বেশ। বাকি বক্তব্য আমরাই খুঁজে বের করব। আপনি শুধু এইটুকু বলুন, যে লোকটিকে আপনি পরপুরুষ বলছেন সেই লোকটিকে আপনি কখনও দেখেছেন?

এবার কিছুটা অপ্রস্তুত মনে হল মি. রাস্তোগিকে।

- না। সরাসরি দেখা হয়নি।

- তাহলে কী করে মিসেস রাস্তোগিকে আপনি সন্দেহ করেছিলেন যেখানে আপনি কোনো পরপুরুষকে দেখতেই পাননি?

- কারণ, আমি সেই পরপুরুষের গায়ের পোশাক বহুবার আমার আলমারিতে পেয়েছি। এছাড়াও পেয়েছি আমার স্ত্রীকে দেওয়া দামি সব উপহার। বেডরুমে ঢুকে বহুবার মনে হয়েছে কিছুক্ষণ আগেই এই বেডরুমে...

কাঠগড়াকে আঁকড়ে ধরে থামলেন মি. রাস্তোগি।

- হুম। তাঁর মানে আপনি শুধুমাত্র অন্য লোকের পোশাক, দামি

উপহার এসব দেখে শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে একটা পরপুরুষের সৃষ্টি করেছেন। পাকাপোক্ত প্রমাণ আপনার কাছে নেই। ঠিক?

প্রশ্নটায় একটা লোক ঠিক যতটা মুখ বিকৃত করতে পারত, ততটা বিকৃত করেই মাথা নাড়লেন মি. রাস্তোগি।

- দ্যাটস অল, মহামান্য। মি. রাস্তোগির কাছে এখনও সেরকম কোনো প্রমাণ নেই যে মিসেস রাস্তোগির কোনো গুপ্ত প্রণয়ী ছিল। সবটাই অনুমান। হয়তো কোনো আত্মীয়স্বজন সেইসব জিনিস উপহার দিয়েছিল এবং আলমারির সেসব পোশাকও হয়তো মিশেষ রাস্তোগির কোনো ভাইয়ের, এমনকি মি. রাস্তোগিকে উপহার দিতে হয়তো তিনিই কিনেছিলেন। কিন্তু মি. রাস্তোগির সন্দেহের কারণে ঘৃণায় সেসব বলেননি। গুপ্ত প্রণয়ী দ্বারা হত্যা এখানে প্রযোজ্যই নয়, মহামান্য।

বক্তব্য শেষ করে নিজের জায়গায় ফিরে গেল ইলিয়াস। অভিযুক্ত মি. রাস্তোগি জজসাহেবের আদেশ নিয়ে নেমে এল কাঠগড়া থেকে। তারপর বলল,

- আমি মি. সুবিমল ভার্মাকে কাঠগড়ায় ডাকতে চাই।

জজসাহেবের অনুমতিক্রমে সুবিমল ভার্মা কাঠগড়ায় এলেন। মি. রাস্তোগি প্রশ্ন করতে থাকলেন,

- আপনার সাথে মিসেস রাস্তোগির কী সম্পর্ক?

- আমি ওর একমাত্র মামাতো ভাই।

উত্তরে আদালতের সবাই একটু নড়েচড়ে বসল। আগে কখনও সাক্ষী হিসেবে মি. ভার্মাকে আদালতে দেখা যায়নি। প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে।

- আপনি বর্তমানে কোথায় থাকেন?

- ওয়াশিংটন ডিসি।

- যেদিন আপনার বোনের হত্যা হয় সেদিন কোথায় ছিলেন?

- সেদিন রবিবার ছিল। আমার ছুটির দিন। বাড়িতেই ছিলাম।

- হত্যার খবর আপনি কবে নাগাদ পান?

- দিন দুয়েক পর। তা'ও খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে।

- কেউ আপনাদের খবর দেয়নি যে আপনার বোনকে হত্যা করা হয়েছে?

- আসলে বিয়ের পর আমার বোন, আমার ও আমার পরিবারের সাথে সেভাবে সম্পর্ক রাখেনি। আমরা চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু একটা সময়ের পর সবটাই যখন একতরফা হয়ে গেল তখন আর সম্ভব ছিল

না। আর আমার বোনের আমরা ছাড়া সেভাবে কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। পিসিমা মানে মিসেস রাস্তোগির মা অনেক আগেই মারা গেছিলেন। তারপর তাঁর স্বামী আবার বিয়ে করেন। ওকে রেখে যান আমাদের বাড়িতেই। সেখানেই সে মানুষ। আমরা একটা সময় দেশ ছেড়ে পাড়ি দিই আমেরিকায়। মি. রাস্তোগি ব্যাবসা সংক্রান্ত কাজে সেখানে এলে আমাদের পরিচয় হয়। সেখানেই তাঁদের প্রেম। পরবর্তীতে দেশে এসেই তাঁরা বিয়ে করেন। ইতোমধ্যে আমার সাথে মি. রাস্তোগির ব্যাবসা সংক্রান্ত কিছু গোলমাল হয়। হয়তো সেই কারণেই আর যোগাযোগে থাকা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে।

শেষদিকের সব কথাই মি. ভার্মা জজসাহেবের দিকে ফিরে বলেন।

- অনেক ধন্যবাদ, মি. ভার্মা। একটা শেষ প্রশ্ন। কখনও আমার অজান্তে খুব দামি কোনো উপহার আপনার বোনকে পাঠিয়েছিলেন কি? অথবা সে আপনাকে শার্ট অথবা স্যুট কিছু পাঠিয়েছিল?

মি. রাস্তোগি প্রশ্ন শেষে সরাসরি চাইলেন।

- নাহ্। বিয়ের সময় উভয়েই উভয়কে কিছু মূল্যবান উপহার দিলেও তারপর আর কিছু দেওয়া বা নেওয়া হয়ে উঠেনি।

এবারেও জজসাহেবের দিকে তাকিয়েই উত্তর দিলেন মি. ভার্মা। বোঝাই যাচ্ছিল তাঁর কী ভীষণ রাগ-অভিমান মি. রাস্তোগির প্রতি।

- আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি এবার আসতে পারেন।

জজসাহেবকে অভিবাদন জানিয়ে মি. ভার্মা নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন।

মি. রাস্তোগি এবার এক এক করে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টের প্রায় সবাইকে কাঠগড়ায় ডাকলেন এবং সবাইকে শুধু এইটুকু জিজ্ঞেস করলেন,

- আপনি আগেরবার সাক্ষী দিয়েছিলেন যে মিসেস রাস্তোগির অ্যাফেয়ার ছিল। তিনি যে পরকীয়ায় আসক্তা ছিলেন তা আপনি কী করে বুঝেছিলেন?

সবার যৌথ উত্তরে আদালতে উপস্থিত সবাই স্তম্ভিত হয়ে রইল। অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দারা জানালেন যে তাঁরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষকে মি. রাস্তোগির অনুপস্থিতিতে তাঁর ফ্ল্যাটে আসতে দেখেছেন। কারও চুল বড়ো, কারও চুল কদমছাঁট, কেউ ফরসা তো কারও গায়ের রং চাপা। এমনকি লিফটম্যান পর্যন্ত জানাল যে মি. রাস্তোগি

বেরিয়ে যাবার পরই যে এরা আসত। আর তাদের কেউই লিফটে উঠত না। সিঁড়ি বেয়েই ওপরে উঠে যেত।

সব শেষে মি. রাস্তোগি বলল,

- ধর্মাবতার, ইলিয়াসবাবু বলেছিলেন গুপ্ত প্রেমিকের থিয়োরি এইক্ষেত্রে প্রযোজ্যই নয়। কিন্তু মিসেস রাস্তোগির না ছিল কোনো পরিচিত ভাই যাকে সে সেইসব পোশাক উপহার হিসেবে দিতে পারে, না ছিল কোনো পরিজন যারা তাকে এতো দামি দামি সব উপহার পাঠাতে পারে। অ্যাপার্টমেন্টের প্রায় সবাই বলছে যে আমি বেরিয়ে যাবার পর অনেকেই আসত আমার বাড়িতে। কথাটা জানাটাও যেখানে অপমানজনক, সেখানে আমাকে আদালতে দাঁড়িয়ে সেটা প্রমাণ করে দেখাতে হচ্ছে। আমি আদালতের কাছে অনুরোধ করব যে আমাকে এরকম হীন কাজ থেকে মুক্ত করে নির্দোষ ঘোষণা করতে।

ইলিয়াস আর বসে থাকতে পারে না।

- অবজেকশন, মাই লর্ড! যদি আদালতে এটা প্রমাণ হয়েও যায় যে মিসেস রাস্তোগির এক বা একাধিক প্রণয়ী ছিলেন কিন্তু এটা তো প্রমাণ হচ্ছে না যে মি. রাস্তোগি খুন করেননি। বরং এত প্রণয়ী আছে জানতে পারা মানে খুন করার মোটিভ পেয়ে যাওয়া। তাই নয় কী?

এই শেষ প্রশ্নটি শোনামাত্র মি. রাস্তোগি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। মুখ খিঁচিয়ে বোধহয় অঙ্গভঙ্গি করে উঠতেন যদি না জজসাহেব বলে উঠতেন,

- মোটিভ পেয়ে যাওয়া মানেই খুন করা নয়, মি. ইলিয়াস। প্রমাণ চাই। আছে?

- আমাকে দিন পনেরো সময় দিন। আমি প্রমাণ নিয়ে আসছি।

- বেশ।

জজসাহেব তারিখ লিখতে যাবেন ঠিক এই সময় ইলিয়াস আবার বলল,

- ধর্মাবতার, আমার একটা অনুরোধ আছে।

- কী অনুরোধ?

- এই দু'দিন আমার ক্রাইম সিনে প্রবেশের অবাধ অধিকার চাই।

জজসাহেব চশমা খুলে কিছুক্ষণ ভাবলেন। সমস্ত আদালতের প্রায় সবার দিকে একবার তাকিয়ে চশমাকে স্বস্থানে ফেরালেন।

- গ্রান্টেড।

জজসাহেব উঠে চলে গেলেন। পুলিশ এগিয়ে এল মি. রাস্তোগিকে হেফাজতে নেওয়ার জন্য। তাদের পাশ কাটিয়ে ইলিয়াস কালো কোট খুলে বেরিয়ে গেল আদালতের পেছনের দরজা দিয়ে। বাইরে অপেক্ষারত জনগণ আর গণমাধ্যম জানতে পারল না ভেতরে কী ঘটল। শুধু জানতে পারল পরবর্তী তারিখ।

পনেরো দিন যথাসময়ে শেষ হল। ইতোমধ্যে উকিলবাবুকে যখন তখন শহরের বিভিন্ন প্রান্ত এবং ক্রাইম সিনে ঘুরঘুর করতে দেখা গেল। শুধু উকিলবাবু জানতে পারল না যে তার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে কয়েকজন তার সব গতিবিধির ওপর লক্ষ রেখে চলেছে।

***

"আজকে প্রথমার্ধের সাক্ষ্য-প্রমাণাদির ওপর ভিত্তি করে আদালত সিদ্ধান্ত নেবে যে মিসেস রাস্তোগি হত্যা মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ পেছোবে, না কি আজই দ্বিতীয়ার্ধে তা সম্পূর্ণ হবে। মি. ইলিয়াস মোহম্মদ শেষ তারিখে জানিয়েছিলেন যে তাঁর সাক্ষ্য-প্রমাণ খোঁজার জন্য কিছু সময় চাই। আজ সে সময়ের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। আদালত মি. ইলিয়াস মোহম্মদের কাছে জানতে চাইছে যে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ কি তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছেন?"

জজসাহেব দিনের শুরুতেই ইলিয়াসের কাছে প্রশ্ন রাখলেন।

- আম্মার মনে হয় আমার কাছে উপযুক্ত প্রমাণ রয়েছে যা দিয়ে মি. রাস্তোগিকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়।

- প্লিজ প্রসিড।

- আমি আজ শুরুতেই শেষ তারিখের সমস্ত সাক্ষীকে পুনরায় জেরা করতে চাই। বিশেষ করে অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দাদের।

এক এক করে সেদিনের সবাই কাঠগড়ায় এলেন। সবাইকে একই প্রশ্ন করল ইলিয়াস। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি ছিল নিম্নরূপ—

- মি. রাস্তোগি বাইরে যাবার পর যারা ফ্ল্যাটে আসত তাদের মধ্যে কাদের আপনারা শনাক্ত করতে পারবেন?

- সেভাবে কাউকেই শনাক্ত করা যাবে না। তবে...

- তবে কী?

- কয়েক জনকে হয়তো শনাক্ত করা যেতে পারে।

- কী করে?

- পেশাভিত্তিক পৃথকীকরণ।

- যেমন?

- কেউ ধোপা, কেউ দুধওয়ালা, কেউ প্লাম্বার ইত্যাদি।

- মানে গুপ্ত প্রণয়ী তাদের মধ্যেও হতে পারে?

- ছি ছি! তা কেন? তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাইরে থেকেই কাজ সেরে চলে যেত। কিন্তু তাদের আমরা এজন্য চিনতে পারছি কারণ তাঁরা নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম পরে আসত অথবা তাদের সাথে যেসব জিনিস থাকত সেসব তাদের জীবিকার ইঙ্গিত দিত।

- বেশ। বুঝলাম। আচ্ছা শেষ প্রশ্ন, তারা যখন আসত তখন মি. রাস্তোগি কি বাড়িতে থাকতেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে অ্যাপার্টমেন্টের বাকিরা সঠিকভাবে কিছুই বলতে পারল না। একমাত্র লিফটম্যান বলল,

- আমি নিশ্চিত যে সেই সময় মি. রাস্তোগি ফ্ল্যাটে থাকতেন না।

- কী করে নিশ্চিত হলেন?

- মি. রাস্তোগি সবসময় লিফট ব্যবহার করেন। আমি এখানে কাজ করি আজ প্রায় পাঁচ বছর। তিনি লিফট দিয়ে নিচে নেমে চলে যাবার পরই এসব লোকজন তার ফ্ল্যাটের দিকে যেত। সাধারণত দুধওয়ালার যে সময়ে আসার কথা বা অন্য সব ফ্ল্যাটে যারা আসে, তারা যে সময় আসে, মি. রাস্তোগির দুধওয়ালা সেসময় আসত না। এমনকি এক-একদিন এক-এক সময়ে আসত।

- এক মিনিট, এক মিনিট। মি. রাস্তোগির বাড়িতে যারা সার্ভিস দিত তারা কী অন্য কোনো ফ্ল্যাটে সার্ভিস দিত?

- আমাদের কাছে সব লেখা থাকে কে কোন ফ্ল্যাটে যাচ্ছে। সেইটা এই মুহূর্তে আমার সাথে নেই। সেটা দেখলেই আমি বলতে পারব যে তারা অন্য কোনো ফ্ল্যাটে সার্ভিস দিত কি না।

- আচ্ছা, বেশ। আপনি কখনও কিছু দেখেছিলেন কি, যা আপনার চোখে অস্বাভাবিক ঠেকেছিল?

লিফটম্যান কিছুটা ভাবল। তারপর আচমকাই কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে ভাব করে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল,

- এই সার্ভিসম্যানরা কোনোদিন আমার লিফটে চড়েনি। সবসময় ব্যবহার করেছে সিঁড়ি।

- প্লিজ মাই লর্ড, এই পয়েন্টটা খুব গুরুত্বপূর্ন। প্লিজ নোট ডাউন

করুন। এবার আপনি আসতে পারেন। আমার জিজ্ঞাস্য আপাতত শেষ।

লিফটম্যানকে ইলিয়াস কাঠগড়া থেকে বেড়িয়ে আসতে বলল। কিন্তু ঠিক তখনই মি. রাস্তোগি উঠে দাঁড়ালেন,

- আমার একটি প্রশ্ন করার আছে। আপনি প্লিজ আর দু'মিনিট ওখানে দাঁড়ান।

জজসাহেব জানালেন,

- প্রসিড।

- আপনি বললেন আপনি পাঁচ বছর ধরে আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে কাজ করছেন। ভালো। কিন্তু এটা বলেছেন কী যে আমাদের তরফ থেকে নেশা করে লিফটে কাজ করার জন্য আপনার ওপর ক'বার ওয়ার্নিং পড়েছে?

ইলিয়াস চিৎকার করে "অবজেকশন, মাই লর্ড" বলে চিৎকার তো করে উঠেছিল, কিন্তু জজসাহেব বোধহয় আসল সত্যি খোঁজার ব্যাপারে সব জানতে চান। শোনা গেল,

- অবজেকশন ওভাররুলড।

লিফটম্যান হাত কচলাচ্ছে দেখে মি. রাস্তোগি আবার বললেন,

- আদালতকে আপনার আইসাইটের ব্যাপারে জানাতে পারবেন কি?

লিফটম্যান এবার করজোড়ে জানাল,

- আমি এখন আর ওসব করি না, মালিক। ওসব নেশাভাঙ কবেই ছেড়েছি। তবে জজসাহেব, এটা সত্যি যে আমার আইসাইট অন্য সব সুস্থ মানুষের মতো অতটা পরিষ্কার নয়, ঝাপসা।

- ধর্মাবতার, এই হচ্ছে লিফটম্যান মি. দাসের মেডিক্যাল রিপোর্ট। আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট এঁকে এখনও দয়া করে কাজে রেখেছে। উনি ভালোভাবে দেখতেই পান না। তাই আমার দাবি ওঁর বক্তব্যকে আদালতে যেন গ্রহণ না করা হয়।

এবার ইলিয়াস আবার অবজেকশন জানাল এবং এবার জজসাহেব সেই অবজেকশনকে স্বাগত জানালেন। উত্তরে বললেন,

- ওঁর আইসাইট খারাপ হলেও উনি মানুষ চিনতে পারছেন। আমাকে আপনাকে চিনতে ওঁর কোনো অসুবিধাই হয়নি। সেক্ষেত্রে মি. দাসের সাক্ষ্য আদালতে গ্রহণযোগ্য।

- থ্যাংক ইউ, মাই লর্ড।

ইলিয়াস প্রায় মি. রাস্তোগির কানের কাছে এসেই জজসাহেবকে

ধন্যবাদটা জানাল। মি. রাস্তোগি চোখ ঘুরিয়ে ইলিয়াসকে দেখে নিজের জায়গায় ফিরে এলেন।

- মাই লর্ড, এতক্ষণে আদালতে এটা প্রমাণিত যে একমাত্র মি. রাস্তোগির অনুপস্থিতিতেই মিসেস রাস্তোগির সাথে দেখা করতে সবাই আসত, সে সার্ভিসম্যান হোক, গুপ্ত প্রণয়ী হোক কিম্বা ঘাতক হোক। আগামী সময়ে অ্যাপার্টমেন্টের রেজিস্টার দেখলেই প্রমাণিত হয়ে যাবে সেইসব সার্ভিসম্যানরা শুধুমাত্র মিসেস রাস্তোগিকেই সার্ভিস দিত, না কি অন্য খদ্দেরও তাদের ছিল।

- অবজেকশন। এত সব করে আমার মনে হয় আমরা শুধু সময় নষ্টই করছি। এগুলি আমাকে মানে মি. রাস্তোগিকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে না।

মি. রাস্তোগি টেবিল চাপড়ে তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

- অবজেকশন সাসটেইনড। মি. ইলিয়াস আপনি যা প্রমাণ করলেন, সেগুলি কিন্তু এখনও মি. রাস্তোগিকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

জজসাহেব কিছুটা সহানুভূতি নিয়েই ইলিয়াসের কাছে জবাবদিহি চাইলেন।

- আমি জানি, মহামান্য। আমাকে আজ দুপুরের সময়টুকু দিন। আমি আজই বাকি ঘটনার সত্যাসত্য আদালতের সামনে তুলে ধরছি।

- ঠিক আছে। আজকে বিকেল চারটে পর্যন্ত আদালত মুলতুবি থাকল। চারটেতে আবার এজলাসে এই মামলার শুনানি হবে। যদি আজ দুপুরের মধ্যে মি. ইলিয়াস উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি দেখাতে ব্যর্থ হন তবে মি. রাস্তোগিকে বেকসুর খালাস করা হবে এবং আদালতের অকারণ সময় নষ্ট করার জন্য মি. ইলিয়াসকে দণ্ডিত করা হবে। কী কারণে মি. ইলিয়াসকে দণ্ডিত করা হবে সেকথা আমরা আদালত মারফত সবাই আজকেই জানতে পারব।

কথা শেষ করে জজসাহেব উঠতে যাবেন ঠিক এমন সময় মি. রাস্তোগি দাঁড়িয়ে একটা অনুরোধ রাখলেন,

- মহামান্য, আমি আদালতের কাছে অনুরোধ করব মিসেস রাস্তোগি হত্যা মামলার এই শেষ এজলাস সবার জন্য মুক্ত করা হোক, নইলে সমাজ জানতে পারবে না শুধুমাত্র একটি মামলার জন্য আদালত নিজের মধ্যে ঠিক কী পরিবর্তন এনেছিল।

জজসাহেব পুনরায় নিজের চেয়ারে বসে পড়লেন। অনেকটা সময় চিন্তাভাবনা করলেন। তারপর বললেন,

- এই মামলা সত্যিই অভিনব। আদালত এখনও জানে না এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হবে কি না। যদি হয় তাহলে হয়তো আগামীদিনেও কোনো উকিল সত্যি আবিষ্কার করতে এই পথ অবলম্বন করতে পারবে। যদি না হয় আর কেউ হয়তো মি. ইলিয়াসের মতো সাহসী হতেই পারবে না। আদালত সমস্ত কিছু বিবেচনা করে মি. রাস্তোগির প্রস্তাবে সিলমোহর লাগাচ্ছে। আদালতের শেষ এজলাস সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

জজসাহেব কোর্টরুম থেকে বেড়িয়ে গেলেন এবং আদালত চত্বরে একটা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। ইলিয়াস উকিলকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরতে দেখা গেল। ট্যাক্সি বেরিয়ে যেতেই তার পেছনে ধাওয়া করল একটা জিপ।

ঠিক চারটেতে আদালত চত্বরে তিল ধরার জায়গা রইল না। সাধারণ মানুষ থেকে গণমাধ্যম, থিক থিক করতে লাগল মানুষে। আদালত সবার জন্য খুলে দেবার খবর আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। সবাই এসে ভিড় করল আদালত কক্ষের বাইরে। কিন্তু দরজা এখনও বন্ধ। বাইরে সবাই অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে থাকল।

জজসাহেব নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর চেয়ারে এসে বসলেন। আইনের বাটখারা তোলা অন্ধ মূর্তিকে কিছুটা এগিয়ে দিলেন। তারপর বললেন,

- আদালত-কক্ষের দরজা সবার জন্য খুলে দেওয়া হোক এবং শুধুমাত্র গোপনীয়তা বজায় রাখার স্বার্থে যতক্ষণ না আদালত এই মামলার রায় দিচ্ছে ঠিক ততক্ষণ সকলের মোবাইল ফোন এবং ক্যামেরা পুলিশের হেফাজতে রাখা হোক। এইক্ষেত্রে আদালত পুলিশকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে আদেশ দিচ্ছে— কারও সম্পত্তি যেন কোনোভাবে নষ্ট না হয়।

অবিলম্বে আদালত-কক্ষ উন্মুক্ত হল এবং মোবাইল ও ক্যামেরা পুলিশ নিজের জিম্মায় নিল। কেউ বিশেষ আপত্তি করল না কারণ সবাই আদালত-কক্ষের দৃশ্য চর্মচক্ষে দেখতে চাইছিল। কিছুটা সময় নষ্ট হল ঠিকই কিন্তু তারপর আবার সেই পিনড্রপ...

- মি. ইলিয়াস এবং মি. রাস্তোগিকে আদালত আদেশ দিচ্ছে আপনারা নিজেদের আসনে ফিরে আসুন।

জজসাহেবের আদেশানুসারে সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই আদালতের পেছনের দুটি রুম থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের জায়গায় বসলেন। এই প্রথম দুজনকে জনসাধারণ দেখল এবং স্বাভাবিকভাবেই সবার মনে কিছু প্রশ্ন এল। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না। নাটক সবেমাত্র শুরু, সবাই আর একটু দেখতে চাইছে।

- মোকদ্দমা শুরু হোক। মি. ইলিয়াস শুরু করুন।

গোটা আদালত-কক্ষকে হতবাক করে দিয়ে উকিল কোর্ট পরা মি. রাস্তোগিকে উঠতে দেখা গেল। একটা চাপা গুঞ্জন উঠল আদালতে। জজসাহেব তৎক্ষণাৎ সামনে রাখা কাঠের হাতুড়ি হাতে নিলেন,

- অর্ডার, অর্ডার! মোকদ্দমা চলাকালীন কেউ কোনোরকম হট্টগোল করবেন না। আপনাদের মনে স্বভাবতই অনেক প্রশ্ন আসতে পারে। আদালত সেসব প্রশ্নের উত্তর যথাসময়ে দেবে। ততক্ষণ কেউ আদালত-কক্ষের অবমাননা করলে তাঁকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হবে।

আদেশে কাজ হল। আবার সেই পিনড্রপ সাইলেন্স। শুধু লোকের চোখাচোখি কথা বলা বাড়ল।

ইলিয়াস উকিলের কোট পরিহিত মি. রাস্তোগি বললেন,

- ধর্মাবতার, আপনার কাছে এখন আমি অ্যাপার্টমেন্টের রেজিস্টারের সেই কপি জমা করছি যাতে উল্লিখিত আছে যে মিসেস রাস্তোগির কাছে যেসব সার্ভিসম্যান যেত, তাদের কেউ অন্য কোনো ফ্ল্যাট এমনকি পার্শ্ববর্তী অন্য কোথাও সার্ভিস দিত না। এমনকি পুলিশি রিপোর্টটিও আমি জমা করছি যেখানে উল্লিখিত আছে এই রেজিস্টারে সার্ভিসম্যানরা যে ঠিকানার উল্লেখ করেছে সেই ঠিকানায় এই নামের কেউ থাকে না, কোনোদিন থাকতও না।

জজসাহেব মন দিয়ে জমা দেওয়া কাগজপত্রগুলি দেখতে লাগলেন। দেখা শেষে প্রশ্ন করলেন,

- তবে যে লোকগুলি আসত, তারা কারা?

ইলিয়াসরূপী মি. রাস্তোগি এবার হাসলেন। তারপর একটা মোড়ক খুলে জজসাহেবের দিকে এগিয়ে দিলেন ,

- এই দেখুন, এই হচ্ছে অ্যাপার্টমেন্টের সিসি ক্যামেরার তোলা ছবি যেখানে মিসেস রাস্তোগির কাছে আসা সব সার্ভিসম্যানের ছবি দেখা যাচ্ছে। খুব খেয়াল করে দেখুন, ছবিগুলি দুটো জিনিস প্রমাণ করছে। এক, লিফটম্যান যা যা বলেছিল সব সত্যি। সার্ভিসম্যানরা

সবাই লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ির পথেই যাতায়াত করত। আর দ্বিতীয়ত, এরা সবাই সিসি ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলগুলি ভালভাবেই জানত, যে কারণে কারও মুখ এই ছবিগুলিতে ধরা পড়েনি। তার মানে, এরা সবাই এই অ্যাপার্টমেন্ট সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই খোঁজখবর রাখে এবং নিজের পরিচয়ও গোপন করতে চায়। অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দারা আগেই জানিয়েছেন যে তাঁরা এদের চেহারা সরাসরি কখনও দেখেনি। ছবিতেও স্পষ্ট, এরা হয় লম্বা টুপি পরত অথবা মুখে দিত স্কার্ফ।

জজসাহেব এবার ছবিগুলি খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন,

- এরা তবে কারা? মিসেস রাস্তোগি হত্যার সাথে এদের সম্পর্কই বা কী?

- মহামান্য, এই প্রশ্নের উত্তর আমি কিছুক্ষণ পর দিচ্ছি। তার আগে একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ভালোভাবে দেখুন, এদের সবার উচ্চতা প্রায় এক। সিঁড়িপথে লাগানো পুরোনো বিমের সাথে প্রত্যেকটি ছবি তোলা হয়েছে। মেঝে থেকে বিমের নির্দিষ্ট অংশ অব্দিই এদের সবার উচ্চতা। প্লিজ নোট ডাউন করে রাখুন এই অংশটা এবং এখন আমি এরকম একজনকে কাঠ গড়ায় ডাকতে চাইব যার সাক্ষ্যর ওপর এই মামলার সমাধান অনেকটাই নির্ভর করছে।

- তিনি কে?

- ডক্টর অনিমেষ বড়ুয়া। মি. রাস্তোগির বাল্যবন্ধু তথা একজন সাইকায়াট্রিস্ট।

- প্লিজ প্রসিড।

- থ্যাংক ইউ, মাই লর্ড।

ডক্টর অনিমেষ বড়ুয়া কাঠগড়ায় এলেন।

- আপনি রাস্তোগি পরিবারকে কবে থেকে চেনেন?

- আই এবং আপনি... মানে মি. রাস্তোগি ছোটোবেলায় একসঙ্গে পড়তাম। তখন থেকেই আমাদের পরিচয়।

- আমি মি. রাস্তোগি নই। আমি উকিল। নাম ইলিয়াস মোহম্মদ। আমাকে আপনি মি. রাস্তোগি বলছেন কেন?

অবস্থার গুরুত্ব বুঝে জজসাহেবকে বলতে হল,

- উনি ভুল করে বলেছেন। মি. বড়ুয়া, আপনি মামলার গুরুত্ব এবং পরিস্থিতি বুঝে উত্তর দিন।

- সরি। আমার ভুল হয়ে গেছে।

ডক্টর বড়ুয়া নিজেকে সামলে নিলেন। প্রশ্নোত্তর চলতে লাগল,

- আপনি কি দয়া করে আদালতকে জানাবেন যে কলেজ-জীবনের পরবর্তী সময় থেকে মি. রাস্তোগির মধ্যে কীরকম অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দেয়?

- নিশ্চয়ই। কলেজ শেষ হবার কিছু সময় পর থেকেই মি. রাস্তোগি ডিসোসিয়েটিভ আইডেন্টিটি ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত। এই রোগটিকে আমরা সাধারণ ভাষায় বলি মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার। আমিও তখন চিকিৎসক হিসেবে নতুন। তাই পরামর্শ দিয়েছিলাম অন্য ভালো কোনো ডক্টর দেখাতে। কিন্তু তিনি একগুঁয়ে হয়ে রইলেন যে আমার কাছেই তিনি চিকিৎসা করাবেন। দীর্ঘ দশ বছর আমি তাঁর চিকিৎসা করি। কিন্তু সাফল্য পাই না। সেকথা আমি তাঁকে এবং পরবর্তীকালে মিসেস রাস্তোগিকেও জানাই। শেষদিকে এরকম হয়েছিল যে, কোনো চরিত্র সম্পর্কে যদি তিনি কৌতূহলী হতেন কিম্বা সেই চরিত্র নিয়ে তিনি ভাবতেন, তাহলে তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি তাঁর প্রকৃত আইডিন্টিটি ভুলে ওই চরিত্রের মতো বিহেভ করতে থাকতেন। আর আমাকে মহামান্য আদালত ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমি যে সত্যি বলছি তা আলাদা করে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সবই আমরা চোখের সামনে দেখছি।

শেষ কথায় জজসাহেব মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করলেন।

- ঠিক আছে। আপনি এখন নিজের জায়গায় গিয়ে বসুন।

ডক্টর বড়ুয়া কাঠগড়া থেকে নেমে চলে গেলেন এবং এরপর ঘটল আসল নাটক যা দেখে গোটা আদালত স্তম্ভিত হয়ে গেল।

আসল ইলিয়াস মোহম্মদ যে বারবার মি. রাস্তোগি সেজে কাঠগড়ায় উঠেছিল, সে এবার উঠে দাঁড়িয়ে জজসাহেবকে বলল,

- মহামান্য, এই মামলা এখন একদম শেষ পর্যায়ে দাঁড়িয়ে। আমাদের যা যা প্রমাণ করার ছিল তাঁর প্রায় সবটাই আমরা প্রমাণ করে ফেলেছি। কিন্তু এই প্রমাণ মি. রাস্তোগিকে সম্পূর্ণরূপে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়। আমি আদালতের কাছে এবার আর্জি রাখছি আমাকে নিজের পরিচয়ে আসল মি. রাস্তোগিকে কাঠগড়ায় ডাকার অনুমতি দেওয়া হোক।

জজসাহেব কোনো উত্তর না দিয়ে সামনে বসা আর্দালিকে ডেকে কিছু কাগজপত্র ঘাঁটতে লাগলেন। তারপর বললেন,

- এই মামলা শুরুর আগে একটি বিশেষ কমিটি বসে মি. ইলিয়াসের সম্পূর্ণ বিবৃতি শুনেছিল। সেখানে উল্লেখ করা আছে যদি ইলিয়াসবাবু কখনও মনে করেন যে মামলার স্বার্থে আত্মপরিচয়েই মামলা লড়বেন তা তিনি করতে পারবেন। আদালত আপনাকে আত্মপরিচয়ে মামলা লড়ার অনুমতি দিচ্ছে।

- ধন্যবাদ।

ইলিয়াস তার উকিল-কোট নেওয়ার জন্য মি. রাস্তোগির দিকে এগিয়ে গেল।

- কোটটা খুলে দিন।

মি. রাস্তোগি কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। ইলিয়াস আর একটু এগোতেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন,

- মহামান্য, আমি ইলিয়াস মোহম্মদ! মি. রাস্তোগি আপনাদের সামনে আমার কোট খুলতে আসছেন। তাঁকে বাধা দিন।

কথা বলতে বলতেই তিনি পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক পুলিশের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। জজসাহেব অবস্থা আঁচ করতে পেরে পুলিশকে আদেশ দিলেন,

- আপনারা মি. রাস্তোগির কোট খুলে ইলিয়াসবাবুকে দিন এবং মি. রাস্তোগিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান।

পুলিশ মাঠে নামতেই কাজ হল। ইলিয়াসের গায়ে চড়ল তার কোট আর কাঠগড়ায় দেখা গেল আসল রাস্তোগিকে। ইলিয়াস ধীরে ধীরে এগিয়ে এল তাঁর দিকে। মি. রাস্তোগির চোখে এখনও বিস্ময়,

- আপনার নাম?

- ইলিয়াস মোহম্মদ।

- নাহ্, ভুল। আপনি ইলিয়াস নন। ইলিয়াস আমি। মনে করুন আপনার আসল পরিচয়। আপনি মি. রাস্তোগি। ব্যবসায়ী মানুষ আপনি। উকিল নন। মনে করার চেষ্টা করুন।

- নাহ্, আমি ইলিয়াস। আমি উকিল।

ঠিক যতটা উগ্রতা নিয়ে কাঠগড়ার কাঠ খামচে ধরে মি. রাস্তোগি তাঁর ভুল আত্মপরিচয় দিলেন, ঠিক ততটাই উগ্রতা নিয়ে ইলিয়াস বলল,

- না। আপনি মি. রাস্তোগি, একটা সাইকোপ্যাথ, একজন সন্দেহবাদী পুরুষ এবং সর্বোপরি নিজের স্ত্রী'র হত্যাকারী। মনে করুন নিজের আত্মপরিচয়। ভাবুন। মনে করুন আপনি কে, কী ও

কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন। আপনাকে আপনার স্ত্রী'র হত্যাকারী ভাবা হচ্ছে, আপনি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। মনে করুন এসব সত্যি, কিছু বানানো নেই।

শেষদিকের কথাগুলি ইলিয়াস এমন করে বলল যেন মনে হল মঞ্চে দাঁড়ানো কোনো জাদুকর তার জাদুকাঠির ছোঁয়ায় তার সহকারীকে সম্মোহিত করছে। আদালতে এরকম কিছু ঘটবে কেউ কোনোদিন আশা করেনি। সবাই যেন শ্বাস নিতেই ভুলে গেছে।

মি. রাস্তোগি কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে রাখলেন, যেন কিছু ভাবছেন। তারপর বললেন,

- আপনি সঠিক বলছেন।

- কী সঠিক বলেছি আমি?

- আমি মি. রাস্তোগি।

- আপনি আপনার স্ত্রী'কে ভালবাসতেন?

- হুম। খুউব।

- কী কী করতেন সেই ভালবাসার জন্য?

- তাকে সবার থেকে আলাদা করে রাখতাম। কাউকে তার সাথে মিশতে দিতাম না। এমনকি তার পরিবারের থেকেও সম্পূর্ণ দূরত্ব বজায় রাখতে আমি সক্ষম হয়েছিলাম। এতটাই সে আমার ছিল।

- বাড়িতে যেসব সার্ভিসম্যান আসত, তারা কারা ছিল?

- সার্ভিসম্যান? মানে?

- মানে দুধওয়ালা, প্লাম্বার, কিম্বা ধরুন খাবার দিতে আসা কোনো লোক।

- সব... সব আমার পরিচিত।

- আপনার পরিচিত, না কি আপনি নিজে?

মি. রাস্তোগি মাথা তুলে একবার চাইলেন। তারপর বললেন, .

- হতে পারে। আমার ঠিক মনে নেই। আমার মাথার ডানদিকটা খুব ব্যথা করছে।

- আমি আপনার আর অল্প সময় নেব।

- বলুন।

- আপনি কি আপনার স্ত্রীকে সন্দেহ করতেন?

- হুম।

- কেন?

- আমার মনে হত বাড়িতে কেউ এসেছে। আলামারিতে নতুন

নতুন জামা, বেডরুমে অন্য কারও আতরের গন্ধ, এমনকি মাঝে মাঝে পাশের ঘরে বসে মনে হত আমার বেডরুমে কেউ আমার স্ত্রী'কে......

- আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি।

- নাহ্ পারেননি। আপনি ভাবতে পারেন আপনার স্ত্রী স্নান করতে গেছে আর ভেতর থেকে ভেসে আসছে কোনো পুরুষের কণ্ঠ। যেন তারা একে অপরকে নিয়ে খেলায় মেতেছে! পারেন ভাবতে?

মি. রাস্তোগি যেন হঠাৎ করেই ক্ষিপ্র হয়ে উঠতে চাইলেন। ইলিয়াস তাঁর হাতে হাত রেখে তাঁকে শান্ত করল,

- আমি বুঝতে পারি। আমার নিজের স্ত্রী এরকম করলে আমি জানি না কী করতাম। হয়তো তাকে......

- মেরেই ফেলতেন তো?

- কেন? আপনি কি তা'ই করেছেন?

- আমি মানে... আমি?

- মনে করুন বলুন তো ঠিক কীভাবে আপনি আপনার স্ত্রী'কে খুন করেছিলেন। একজন খুনির মতো কীভাবে ভেবেছিলেন আপনি পুরো ছক? মনে করতে পারছেন?

- আমি... আমি... খুনি! আমি খুনি!

- আমরা সেটা জানি। কিন্তু আমরা চাই আপনি সম্পূর্ণ ঘটনা আমাদের বলুন।

জজসাহেব একবার বললেন,

- আপনি বোধহয় একটু বেশি মানসিক চাপ দিচ্ছেন।

- প্লিজ মাই লর্ড, আমাকে এইটুকু করতে দিন। আমি অনেক রিস্ক নিয়ে এই মামলা নিয়েছিলাম। আপনি সবটাই জানেন।

- ওকে। প্রসিড। কিন্তু মি. রাস্তোগির যদি শারীরিক কোনো ক্ষতি হবার উপক্রম দেখা দেয় আমি তৎক্ষণাৎ সওয়াল-জবাব বন্ধ করে দেব।

- ধন্যবাদ। হ্যাঁ তো আপনি কিছু মনে করতে পারলেন, মি. রাস্তোগি?

- পারছি মনে করতে।

- বলুন কী মনে পড়ছে।

- আমি নিজেই ওর প্রেমিক সেজে আসতাম, এমনকি নিজেই ওর হয়ে সব সাজতাম। বাইরের কারও সাথে ওর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ করেছিলাম আমি। আমার খুব ভালো লাগত বিভিন্ন রূপে ওর কাছে ধরা দিতে। আমার মনে হত আমার মধ্যেই পৃথিবীর সব চরিত্র পেয়ে

হয়তো ওরও ভালোই লাগছে।

- তারপর?

- তারপর একদিন মনে হল ওর এসব ভালো লাগছে না। আমি নিজেও আর উপভোগ করছি না। নিজেই নিজের স্ত্রী'র সাথে রমণে যোগ দিয়ে ওকেই সন্দেহ করছি। মাথাব্যথা বাড়তে লাগল। এমনকি কখন কী সেজে আসতে হবে ভুলে যেতে থাকলাম। ভুলে যেতে লাগলাম সব। কেন কী কারণে এরকম হল বুঝে উঠতে পারলাম না। একসময় মনে হল ও আর আমাকে সহ্য করতে পারছে না। মুক্তি চাইছে।

- কী করে মুক্তি দিলেন তাঁকে?

- সেদিন আমাদের বিবাহবার্ষিকী ছিল। আমি অফিসের জন্যে বেরিয়ে গেলাম। আর ঠিক কিছুক্ষণ পর ওর প্রেমিকের সাজে ফিরে এলাম। সিসিটিভি ক্যামেরায় মুখ এড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম। সেদিন বাড়ি ফিরে আমার মনে হয়েছিল যে সত্যিই অন্য কেউ এসেছে।

- আগের বারের মতো এবারও হয়তো আপনি ভুল সন্দেহ করেছিলেন।

- হয়তো। জানি না। শুধু মনে আছে ওর শেষ শ্বাসটি পর্যন্ত রোধ করার ইচ্ছে হয়েছিল আমার।

- আর তারপর আপনি ঠিক সেটাই করেছিলেন এবং সমস্ত কিছু এতটাই পরিকল্পনামাফিক যে আপনার ফিংগারপ্রিন্ট অব্দি পাওয়া গেল না। ঠিক তা'ই তো, তা'ই তো?

- হুম। বোধহয় তা'ই। আমার মাথা এবার খুব ব্যথা করছে।

জজসাহেব এবার বাধা দিলেন,

- মি. ইলিয়াস আমি আর ওঁকে কাঠগড়ার রাখার আদেশ দিতে পারছি না।

- আমার কাজ ইতোমধ্যে শেষ, মাই লর্ড। মি. রাস্তোগি এখুনি সবার সামনে নিজের স্বীকারোক্তি দিয়ে দিয়েছেন।

- আমরা সবাই সেটা শুনতে পেয়েছি। মেডিক্যাল টিম, আপনারা মি. রাস্তোগির পাশে এসে দাঁড়ান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। ইলিয়াসবাবু, আপনি এবার বসুন।

- ধন্যবাদ, মহামান্য। আদালতকে ধন্যবাদ আমার পাশে, সর্বোপরি সত্যের পাশে থাকার জন্য।

আদালতের রায় চলে এল অল্প সময়ের মধ্যেই। মি. রাস্তোগির রি-হ্যাব এবং তারপর সশ্রম যাবজ্জীবন কারাবাস দুই-ই হল।

পরদিন খবরের কাগজ মারফত গোটা দেশ জানতে পারল কী

অভাবনীয় পদ্ধতিতে একজন আইনজীবী তার লাইসেন্স বাজি রেখে একজন দোষীকে শাস্তি পাইয়ে দিয়েছে। ইলিয়াস মোহম্মদ নিজে অনুসন্ধান লাগিয়ে অনুমান করে যে মি. রাস্তোগি একজন মানসিক রোগী এবং এই মামলায় ঘুরেফিরে আসা সকল চরিত্রই আসলে একজন। সমস্ত অনুমান এবং আদালতে কীভাবে মি. রাস্তোগিকে দোষী প্রমাণ করতে চাইছে— সবকিছু লিখিত দস্তাবেশে জমা করে ইলিয়াস। অল্পদিনের আলোচনা এবং দৌড়ঝাঁপের পর তা অনুমোদন পায়। মাল্টিপল পারসোনালিটি ডিজঅর্ডারকে কাজে লাগিয়ে একজন খুনি যেন পার না পেরে যায় সেজন্য ইলিয়াস মোহম্মদ সরকারি সহায়তায় মি. রাস্তোগির সাথে দেখা করে। তাঁর সাথে সময় কাটায় এবং তাঁকে বিশ্বাস করায় যে তাঁর আসল নাম মি. রাস্তোগি নয়, তাঁর নাম ইলিয়াস মোহম্মদ এবং সে একজন উকিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় খরচ করে নিম্ন আদালতে উঠে আসা এক একটি ছোটো বিষয়কে বিশদভাবে বুঝিয়ে দেয় যাতে মামলা লড়ার সময় ইলিয়াসরূপী মি. রাস্তোগির কোনো অসুবিধে না হয়। কাজেই মি. রাস্তোগি আসলে কোর্টে নিজেকেই দোষী প্রমাণ করতে কার্যত কোনো কসর রাখেননি। মামলা চলাকালীন মি. রাস্তোগিকে রাখা হয়েছিল ইলিয়াসের বাড়িতেই। তিনি যখন বেরোতেন তখন তাঁর সাথে পেছনে সবসময় পুলিশি পাহারা থাকত। ছায়ার মতো তারা ঘুরত মি. রাস্তোগির পেছনে। যদি কোনো কারণে ইলিয়াসের এই অনুমান ভুল প্রমাণিত হত, বিশেষভাবে এই মামলার জন্য তৈরি করা কমিটি শুধু ইলিয়াসের লাইসেন্সই বাজেয়াপ্ত করত না, আদালতের সময় নষ্ট করার অপরাধে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করত। কিন্তু ইলিয়াসের বুদ্ধিদীপ্ত ওকালতিতে সে সুযোগ আদালত পায়নি, বরং লাইসেন্স বাজি রেখে এরকমভাবে একটি মামলা লড়ার জন্য ইলিয়াসের প্রশংসা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। নজিরবিহীন এরকম এক আদালত বসানোর জন্য ইলিয়াস মোহম্মদের নাম ভারতীয় আইনি ব্যবস্থায় প্রবাদপ্রতিম হয়ে উঠল।

***

মোকদ্দমা শেষ হবার কয়েকদিন পরের কথা। ইলিয়াস অভ্যাসবশত সেই প্রথমে উল্লিখিত মুহুরির কাছে এসে নিজেই টাইপ করাচ্ছিল। হঠাৎই দেখা হয়ে যায় তার ঘনিষ্ঠ সেই দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে যে

শুরুতে তাকে বারবার মামলা লড়ার আগে সাবধান করেছিল। টাইপ শেষে ইলিয়াস তাকে বলে,

- চলো, আজ আবার চা খেতে যাই ওই ঠেকে।

চায়ের ঠেকে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে,

- তুমি কীভাবে এতকিছু জানলে বলো তো? সব ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে কেউ কিন্তু এভাবে নিজের লাইসেন্সের ঝুঁকি নিতে পারত না। এমনকি কারাবাস অব্দি হতে পারত।

কথাটা শুনে ইলিয়াস তার স্বভাবসুলভ মুচকি হাসি হাসল,

- আসলে কিরণ শেষের দিকে আমাকে সবই বলেছিল।

- কিরণ? কোন কিরণ?

- কিরণ রাস্তোগি। মানে আমাদের মিসেস রাস্তোগি।

- হোয়াট? তোমাকে বলেছিল মানে? তোমাকে ও কী করে চিনত?

- আসলে কিরণ প্রথমে সব মেনে নিয়েছিল, কিন্তু সময়ের সাথে সে সত্যি এরকম পাগলামো সামলাতে সামলাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একদিন হঠাৎ করেই আমাদের পরিচয় হয়। সে ডিভোর্স ফাইল করতে এসেছিল। অবশ্যই লুকিয়ে। সেটা আর ফাইল করা হয়নি কিরণের সাহসের অভাবে। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে যায়। কিছুদিনেই প্রেম। শরীর-শরীর খেলাটা আমাদের ভালোই জমেছিল জানো, কিন্তু একটা সময়ের পর কিরণ আবার এসব থেকে মুক্তি চাইতে থাকে। পাগল নিয়েই পুরো জীবন কাটাবে ভাবতে থাকে। আমি অনেক বোঝাই, কিন্তু না। ততদিনে আমি নিজেও আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি কিরণের প্রতি। হয়তো এক্ষেত্রে আমার পাগলামোটা মি. রাস্তোগির চেয়েও বেশি ছিল।

- মা...নে! কী বলতে চাইছ? এই, সত্যি করে বলো কিরণকে কে খুন করেছে?

ইলিয়াস উঠে দাঁড়াল। আজকে চায়ের বিল সে নিজেই মিটিয়ে দিল। যাবার আগে শুধু অন্যজনকে এইটুকু বলে গেল,

- ভাগ্যিস সেদিন মি. রাস্তোগি ফিরে এসেছিলেন আর আদালতে কেউ এটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি যে ফেসবুক লাইভের আগে এত কম সময়ে গলার নেকলেস কী করে মি. রাস্তোগি জোগাড় করেছিলেন।

ইলিয়াস কীসের যেন একটা বিল কুচি কুচি করে ছিঁড়ে পাশের নর্দমায় ফেলে এগিয়ে গেল। কুচো কাগজগুলিকে নর্দমার জলের স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকল দূরে... বহু দূরে।

খেলনাওয়ালা
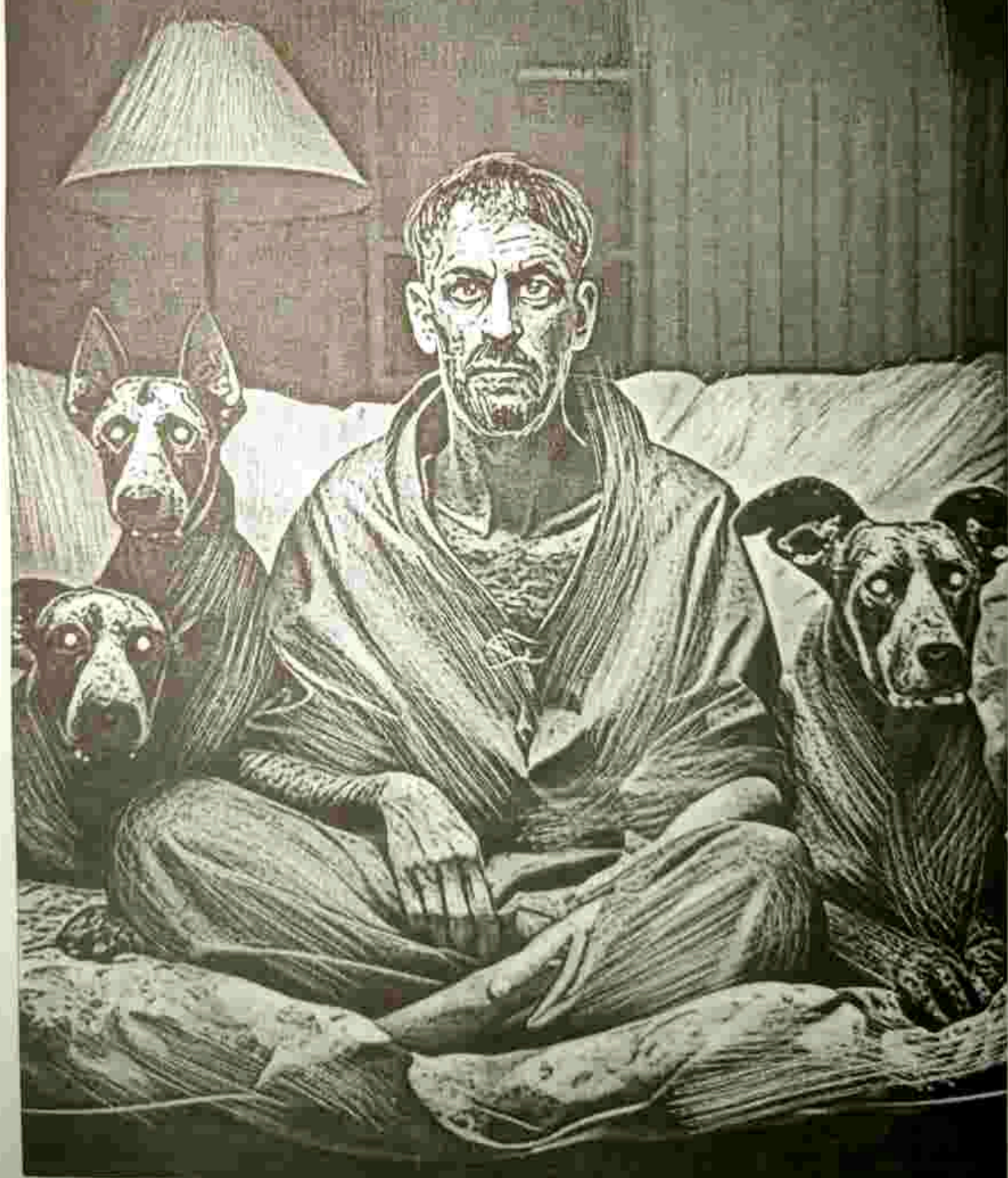
"শুনেছি এই শহরের সমস্ত ভুডু পুতুল আপনার দোকান থেকেই সরবরাহ হয়, এটা সত্যি?"

শনিবার, বিকেল হয়ে এসেছে। কলেজ স্ট্রিটের থেকে বেরিয়ে রাজা রামমোহন রায় স্ট্রিটের দিকে হাঁটতে থাকলে কিছু বিহারি পানের দোকান পড়ে। তাদের পেছনের গলিতে একটা খেলনার দোকান— চামারিয়া টয় হাউস। বহু পুরোনো দোকান। আজকালকার ঝাঁ-চকচকে প্লে-স্টোরের মতো এ দোকান নয়। তবু চামারিয়াজি এই দোকান সারাই করান না। ভেঙে পড়া ঐতিহ্য নিয়ে রোজ দোকানের শাটার খোলেন এবং বিকেলে বন্ধ করেন। দোকান পুরোনো হলে কী হবে, বংশপরম্পরায় কাস্টমার-ভাগ্য বেশ সরেস। যা আয় হয় বেশ চলে যায় তাঁর। মধ্যবয়স্ক চামারিয়াজি কারও সাতেপাঁচে থাকেন না, নিজের সাতেপাঁচেও কাউকে আসতে দেন না। এহেন চামারিয়াজিকে এই শনিবারের প্রাক-সন্ধেতে এক বয়স্ক ভদ্রলোক এসে এই প্রশ্ন করলেন। চামারিয়াজি তাঁকে একবার ভালোভাবে মেপে নিয়ে তাকের ধুলো পরিষ্কার করায় মন দিলেন।

- কী হল? চুপ করে গেলেন যে?

বৃদ্ধ আবার প্রশ্ন করলেন।

- আপনি ভুডু করবেন কাউকে?

চামারিয়াজি না তাকিয়ে উত্তর দিলেন।

- খেপেছেন নাকি! শুনলাম আপনিই নাকি ওসব পুতুল-টুতুল সাপ্লাই করেন, তাই...

- ভুল শুনেছেন। আমি ভুডুর পুতুল সাপ্লাই করি না। সাধারণ পুতুল বিক্রি করি। কেউ তাকে বাড়িতে গিয়ে ভুডুর পুতুল বানিয়ে ফেললে আমার তাতে কিছু করার নেই।

এবারও নিজেকে শান্ত রেখেই উত্তর দিলেন চামারিয়াজি।

- পিন?

বৃদ্ধ আবার প্রশ্ন করেন।

প্রশ্ন শুনেই কটমট করে তাকান চামারিয়া।

- বললাম তো...

- আহা, চটছেন কেন? সেফটিপিন আছে? আমার ছাতাটার সেলাই খুলে গেছে।

বলে বৃদ্ধ নিজের ছাতাটা দেখান।

চামারিয়াজি একটা সেফটিপিন এগিয়ে দিলেন।

- আপকো চাহিয়ে ক্যা?

অভ্যাসদোষে বাঙালি কাস্টমারকেও হিন্দিতে প্রশ্ন করে বসলেন চামারিয়া।

বৃদ্ধ খাটো চোখে এগিয়ে এলেন কাছে, বললেন

- ইস্পেশাল কোনো খেলনা আছে নাকি? হেঁ হেঁ...

চামারিয়াজি এবার উত্তরদিকের খেলনার তাকে এগিয়ে গেলেন এবং একটা ময়লা বাক্স নিয়ে ফিরলেন।

- এটা স্পেশাল।

বৃদ্ধ খপ করে বাক্সটা কেড়ে নিলেন। যেন এটার খোঁজেই ছিলেন। ময়লা চারকোনা এক বাক্স। পাশে রাখা একটা কাপড় দিয়ে মুছে নিতেই স্পষ্ট হল লেখা— পাজল, সিন্স ১৯২১।

- ১৯২১ সাল থেকে পাজল। এটাকে কেউ সমাধান করতে পারেনি নাকি! কী হে?

সন্ধে হয়ে আসা ঘুপচি গলির পুরোনো খেলনার দোকানের মালিককে এবার একটু অন্যরকম লাগে, যেন এ প্রশ্ন তাঁকে নয়, অন্য কাউকে করা হয়েছে। উত্তরও যেন অন্য কেউই দিল।

- নিয়ে যান এটা। এটা একটা স্পেশাল খেলনা। এর ধাঁধার উত্তর এখনও কেউ খুঁজে পায়নি। তাই এটা ফিরে ফিরে আসে এই দোকানে।

বৃদ্ধ ঘাবড়ালেন না। চুপচাপ দাম মিটিয়ে বেরিয়ে গেলেন দোকান থেকে। সন্ধে হয়ে এসেছে। হেঁটে কিছুদূর এগিয়ে একটা পুরোনো অ্যাম্বাসেডরে গিয়ে বসলেন বৃদ্ধ। বাক্সটিকে পাশের সিটে রেখে গাড়ি স্টার্ট দিলেন।

ট্রাফিকে আটকে থাকা শহর পেরোতে দেড় ঘণ্টা বেরিয়ে গেল। যখন বিরাটির রাস্তায় পৌঁছলেন, তখন সন্ধে প্রায় আটটা। এদিকটায় শহর কলকাতার ভিড় নেই। তুলনামূলক ফাঁকা রাস্তা। গাড়ি এসে থামল একটা পুরোনো অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। গাড়ি নির্দিষ্ট জায়গায় পার্ক করে লিফটে চড়ে নিজের ফ্ল্যাটে চলে এলেন বৃদ্ধ। চারতলায় শেষ কোনায় তাঁর ফ্ল্যাট।

বাক্সটাকে কাঁচের টেবিলে রেখে বৃদ্ধ ওয়াশরুমে চলে গেলেন। নিজের চেহারাটাকে একবার আয়নায় দেখে নিলেন। বয়সের ভারে বলিরেখা স্পষ্ট, কিন্তু আজ রাতে নার্ভ ধরে রাখতে হবে তিনি জানেন।

বহু বছর আগে এই বাক্স এই বাড়িতে এসেছিল। সেদিন বৃদ্ধের ছেলের জন্মদিন ছিল। বাইরে চাকরি করতেন তিনি। মানি অর্ডারে টাকা পাঠিয়েছিলেন ছেলেকে, সে যেন কিছু কিনে নেয়। বাড়িতে একা ছিল সে সেদিন। বন্ধুরা কেক এনে জন্মদিন পালন করে চলে যায়। ছবিও তোলা হয় সেদিনের সন্ধ্যায়। ছেলে ফোনে জানিয়েছিল,

- বাবা, তুমি তো জানই আমার ধাঁধা সমাধান করার শখ। একটা ইন্টারেস্টিং পাজল পেলাম আজ। জিনিসটা পুরোনো, কিন্তু দোকানদার এরকম এক কথা বলল যে খুব ইন্টারেস্টিং লাগল। ১৯২১ সালে এই পাজল তৈরি হয়েছিল। তারপর থেকে কেউ নাকি এটার সমাধান করতে পারেনি। এই চ্যালেঞ্জ কেউ ছাড়ে! বলে এলাম যে আগামীকাল সমাধান করে দোকানে গিয়ে দেখিয়ে আসব।

ফোনে দোকানের নামটা আর জিজ্ঞেস করেননি সেদিন বৃদ্ধ। তবে পরদিন ফোনে ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়েছিলেন। সহধর্মিণী সেই শোক থেকে বেরোতে পারেননি। বছর দুই পর মারা যান। কিছু বছর পর রিটায়ার্ড হয়ে ফিরে আসেন বৃদ্ধ।

সেদিন আলমারিতে ছবির অ্যালবামে খুঁজে পেলেন সেদিনের রাতের ছবি। জন্মদিনের হুল্লোড়ের ছবির মধ্যেই দেখতে পেলেন পাজলের বাক্সটিকে, প্যাকেটে জ্বলজ্বল করছিল চামারিয়া টয় হাউসের নাম। পাজলটার কথা তিনি ভুলতে বসেছিলেন, তারপর মনে এল সেদিনের ছেলের ফোনের কথা। সত্যিই তো, ছেলে মারা যাবার পর ঘরে সেদিন এরকম কোনো বাক্স বা পাজল তো পাওয়া যায়নি। বৃদ্ধের মনে হতে থাকল নিশ্চয়ই ওই আনসলভ্ড পাজলের সঙ্গে ছেলের মৃত্যুর কোনো যোগাযোগ আছে। কারণ ছেলের মৃত্যুটাও ঠিক সাধারণ মৃত্যু নয়, খুন করা হয়েছিল তাকে। আর খুনির কোনো চিহ্ন কোথাও ছিল না। পুলিশ কোনো দিশা না পেয়ে কিছু সময় পর ক্লান্ত হয়ে কেস বন্ধ করে দেয়।

বৃদ্ধের ধারণা ওই পাজলের মধ্যেই আছে ওই খুনির হদিশ। চামারিয়া টয় হাউসের ওপর কড়া নজর রেখেছিলেন, চারদিকে খোঁজ নিয়ে জেনেছেন এই খেলনার দোকানটি অদ্ভুত। দোকানের বেশিরভাগ খেলনাই অদ্ভুত। বিশেষত পুতুল। শোনা যায় কলকাতা শহরে এখনও লুকিয়ে লুকিয়ে যেসব ভুডু হয়, মানে কারও নামে পুতুল বানিয়ে তাতে পিন মেরে মেরে তাকে দূর থেকেই শেষ করে দেওয়া, সেইসব

পুতুল এই চামারিয়াজি সাপ্লাই দেন। সবটাই কালোজাদু। যদিও এটা প্রমাণ করার রাস্তা নেই।

নাইট গাউন পরে বসার ঘরে ফিরে এলেন বৃদ্ধ। আলমারি থেকে স্কচ বের করলেন। গ্লাসে ঢেলে নিয়ে তাতে জল আর আইস কিউব মেশালেন। তারপর গিয়ে বসলেন সোফায়। টেবিলে টেনে নিলেন সেই পুরোনো বাক্স। ধুলো ঝেড়ে বাক্স খুলতেই বেরিয়ে এল একটা কাঠের বোর্ড এবং বেশ কিছু কাঠের টুকরো। পাজলের টুকরো। বৃদ্ধ মেলাতে শুরু করলেন সেইসব টুকরো।

যত সময় এগোতে লাগল তত বেশি কপালে চিন্তার ছাপ বাড়তে লাগল বৃদ্ধের। মাঝে মাঝেই তিনি উঠতে লাগলেন, ওয়াশরুমে গিয়ে মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলেন। যা দেখছেন তা যদি সত্যি হয়...

পাশের ঘর থেকে কুকুরগুলো ডাকছে অনেকক্ষণ। পাঁচটে জাত ডোবারম্যান। মনিব এসেছে সে গন্ধ অনেকক্ষণ আগেই পেয়েছে তারা। কিন্তু এতক্ষণ ডাকাডাকি করেনি। বৃদ্ধ আরও সজাগ হলেন। ইতোমধ্যে তিন পেগ খাওয়া হয়ে গেছে। পৃথিবী আর আগেই মতো স্থির নেই।

আর এক পেগ নিয়ে বৃদ্ধ আরও আধ ঘণ্টা বসে বসে মেলালেন পাজল। জুলফির কিনারা বেয়ে ঘাম চুঁইয়ে পড়ছে এবার। ঢকঢক করে গ্লাসের স্কচ শেষ করলেন। আর দু-তিনটে কাঠের টুকরো জুড়লেই সম্পূর্ণ হবে পাজল। ১৯২১ সালের পর হয়তো প্রথমবার, কিন্তু তারপর...

- খোকারা শান্ত হ, রাতের খাবারের ব্যবস্থা করছি। এত চ্যাঁচালে হয়?

পাশের ঘরে ঢুকে ডোবারম্যানগুলোকে আদর করে এলেন বৃদ্ধ। খিদে পেয়েছে এদের। কিন্তু ওদিকে পাজলের শেষ দেখা বাকি। বৃদ্ধ শেষ পেগ নিয়ে বসলেন এবার।

তিনটে টুকরো হাতে নিয়ে ঘোরাচ্ছেন। প্রথমটা বসালেন। কপালে বলিরেখায় ভাঁজ গাঢ় হল। দ্বিতীয়টাও বসিয়ে দিলেন বোর্ডে। গাঢ়তর হল সেই ভাঁজ। একটা ঘরের দৃশ্য ফুটে উঠেছে পাজল বোর্ডে। তাতে রয়েছে একটা লাল সোফা, একটা কালো কাচের টেবিল। টেবিলে কাচের গ্লাস রাখা, ঈষৎ লালাভ সেই গ্লাসের তরল। সোফায় বসা একজন বৃদ্ধ লোক। চেহারা হুবহু যিনি এই পাজল মেলাচ্ছেন তাঁর মতো। ইতোমধ্যে একটা জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘুরেফিরে সেই শব্দ একবার কাছে আসছে একবার দূরে যাচ্ছে।

বৃদ্ধ ঢোঁক গিললেন। পাজলে অবিকল এই মুহূর্তে তাঁর ঘরের ছবি ফুটে উঠেছে। আর তা'ই যদি হয়, তবে একটি কাঠের টুকরো সংযোগ না করেও বোঝা যাচ্ছে যে সোফার পেছনে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ভয়ানক রকমের ধারালো কোনো অস্ত্র নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। যেন অপেক্ষা করছে পাজলে শেষ কাঠের টুকরো সংযোগের। সেই টুকরো সংযোজিত হলেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে এই দৃশ্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ছিন্ন হবে বৃদ্ধের শরীর।

বৃদ্ধ শেষ টুকরোটা হাতে নিয়ে ঘোরাচ্ছেন। মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছেন গ্লাসে। কুকুরগুলো কীসের গন্ধ পেয়ে যেন দ্বিগুণ উদ্যমে ভৌ ভৌ করছে। আরও কিছু সময় ভেবে বৃদ্ধ আচমকাই পূর্ণ করে দিলেন পাজল। পূর্ণতা পেল পাজল। ফুটে উঠল এক সুচারু দৃশ্য যেখানে সোফায় বসা বৃদ্ধকে হাতের ধারালো চৈনিক ভোজালি দিয়ে আক্রমণ করছে এক ব্যক্তি। ভালোভাবে দেখলেই স্পষ্ট হয় সে ব্যক্তির মুখ স্বয়ং চামারিয়াজি।

বৃদ্ধ তড়িৎগতিতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং গ্লাসের স্কচ ছুড়ে মেরেছেন চামারিয়াজির উদ্দেশে। ততক্ষণে চামারিয়াজির প্রথম ভোজালির আঘাত ব্যর্থ হয়েছে। সোফার ওপর আঘাত পড়ায় সোফার ভেতরকার স্পঞ্জ বেরিয়ে এসেছে।

চোখে স্কচ পড়ায় চিৎকার করে উঠলেন চামারিয়াজি। বৃদ্ধ মুখোমুখি সংঘাতে গেলেন না। বরং টেবিলের ওপর থেকে খপ করে তুলে নিলেন সম্পূর্ণ পাজলটা। চামারিয়াজি মুখে একটা ক্রূর হাসি নিয়ে আবার এগিয়ে আসার চেষ্টা করতেই পাজলের মধ্যে থেকে চামারিয়াজির আক্রমণোদ্যত হাতের টুকরোটি খুলে ফেলে দিলেন বৃদ্ধ। মুহূর্তে চামারিয়াজি আবিষ্কার করলেন তার হাত চৈনিক ভোজালি সহ হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। একইভাবে মুহূর্তের মধ্যে একটা পা মিলিয়ে গেল, কারণ পাজল থেকেও তাঁর পা খুলে ফেলে দিয়েছেন বৃদ্ধ। পা-বিহীন চামারিয়াজি এবার মাটিতে পড়ে গেলেন।

- অনেক ব্ল্যাক ম্যাজিক ব্ল্যাক ম্যাজিক খেলেছেন! অনেক ঘরের ছেলেমেয়ের জীবন নষ্ট করেছেন! এবার ধাঁধার সমাধান হবে, ১৯২১-এর পাজল মিলে যাবে। আর কখনও এ পাজল কাউকে মেলাতে হবে না।

বৃদ্ধ প্রায় আপনমনে কথাগুলো বলে পাশের ঘরের দিকে হাঁটতে লাগলেন। খুলে দিলেন সেই ঘরের দরজা। হাত-পাহীন চামারিয়াজি

মেঝেতে পড়ে কাতরাচ্ছেন আর চিৎকার করছেন। বৃদ্ধ ওই ঘরে গিয়ে একে একে পাঁচটা খাঁচা খুলে দিলেন। ক্ষুধার্ত ডোবারম্যানগুলো যে যেভাবে পারল বেরিয়ে সামনের ঘরে চলে গেল।

ওই ঘর থেকে আসতে লাগল পাঁচ ডোবারম্যান আর এক খেলনাওয়ালার নারকীয় চিৎকারের শব্দ। বৃদ্ধ পাশের ঘরের এককোণে রাখা বিছানায় কিছু সময় শুয়ে রইলেন। বাইরের ঘরের চিৎকার যেন তার কানেই আসছে না। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

যখন ঘুম ভাঙল রাত তখন ক'টা কে জানে। বৃদ্ধ উঠে দেখলেন পাঁচটার একটাও এখনও ওই ঘর থেকে ফেরেনি। বৃদ্ধ হাতের কাছেই অবশিষ্ট পাজলটা পেয়ে গেলেন, আসার সময় নিয়েই এসেছিলেন। সেটা মাটিতে ফেললেন। উঠে একটা বোতল থেকে অল্প কেরোসিন ঢেলে দিলেন তাতে। লাইটার জ্বালিয়ে অগ্নিসংযোগ করে বসে রইলেন।

রাত অনেক। শীতের দিন এসে গেছে তো, ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। ধরানো আগুনে হাত সেঁকে নিলেন বৃদ্ধ। দেখতে দেখতে ছাই হয়ে গেল প্রায় একশো বছর ধরে সমাধান না হওয়া এক মানুষখেকো পাজল।

এবার বৃদ্ধ উঠলেন। সামনের ঘরে এলেন। নাহ্, কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। যেভাবে সেদিন পুলিশ তাঁর ছেলের মৃত্যুর পর খুনির কোনো চিহ্ন পায়নি।

ফ্রিজ থেকে একটি আইসক্রিম কেক বার করলেন বৃদ্ধ। ছেলের ছবির সামনে রেখে নিজেই কেটে নিলেন।

কুকুরগুলোকে এখন ডাকলেও উঠবে না, দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভরপেট খেয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

নীল রেনকোটের গা বেয়ে অবিরাম ধারা বয়ে চলেছে। তবু নান্দনিক গড়নের অধিকারিণী চল্লিশোর্ধ্বা মন দিয়ে বিদেশি সিগারেট টেনেই চলেছে। তার কোনো তাড়া নেই। শহরের প্রাণকেন্দ্রের একটা বাই লেন রাস্তা বলেই হোক বা বৃষ্টির জন্যেই হোক, আজ লোকজন কম। ছোটো শহর, এমনিতেও রাত সাড়ে সাতটা বাজলেই ঝিমিয়ে পড়ে। আর আজ যা বৃষ্টি!

মিটার দশেক দূরত্বে একটা লেডিজ বিউটি পার্লার। সেদিকেই তাকিয়ে আছে সে। ঠোঁটের লাল লিপস্টিক সিগারেটের গোড়ায় হলমার্ক আঁকতে ব্যস্ত। ধোঁয়া মুখের বাইরে এসে জলের ছাঁটে কয়েক ভাগে বিন্যস্ত হয়ে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। আশেপাশে রাস্তায় জমে থাকা জল উড়িয়ে মাঝে মাঝেই চলে যাচ্ছে এক-আধটা রিক্সা, সাইকেল, মোটরবাইক। সবাই এই আষাঢ়ে বাড়ি ফিরতে চায়। এককাপ কফি আর খবরের চ্যানেলের তর্ক নিয়ে বসতে চায় সবাই। কিম্বা কোনো ওয়েব সিরিজ বা একটা হলিউডি থ্রিলার। অন্যদিন হলে হয়তো নীল রেনকোটের ভেতরের সুন্দরীও এই পথেই হাঁটত। তবে আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে। পার্লারের ভেতরের এক রমণী বেরিয়ে চলে গেছেন মিনিট পাঁচেক হল। আর কেউ আছে কি না সেই অপেক্ষাই বোধহয় করছে চল্লিশোর্ধ্বা। এবার আরও দু'জন বেরিয়ে চলে গেলেন। এরা বোধহয় কর্মী। পোশাক দেখে সেরকমই আন্দাজ হয়। আরও মিনিট দশেক অপেক্ষা করার মনস্থ করল সে।

এক সময় অপেক্ষা শেষ হল, সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে সেটা নীচের কাদাজলে ফেলে দেয় সে। অভ্যেসবশে একবার সিগারেটের ওপর পা দিয়ে নিজেই মুচকি হাসে। জলকাদায় পড়ে ইতোমধ্যে নিভে গেছে সিগারেট। লাল হলমার্কে কালো কাদা থিকথিক করছে। এগিয়ে চলে আগন্তুক।

পার্লারের দরজায় টোকা দিতেই ভেতর থেকে সুমিষ্ট আওয়াজ আসে,

- বন্ধ হয়ে গেছে।

আগন্তুক ততোধিক মিষ্টি করে বলে,

- শুধু চুলটা একটু ঠিক করতে হবে। আপনার বেশি সময় নেব না।

ভেতরে যে গোছগাছ করার জোগাড় করছিল, সে মধ্য তিরিশে। সে'ই এই পার্লারের মালকিন। ঝড়বাদলার দিনে সবাইকে ছুটি দিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরবে ভেবেছিল সে। তাছাড়া শহরে ক'দিন ধরে এক আতঙ্কের উৎপত্তি হয়েছে। মেয়েরা উধাও হয়ে যাচ্ছে শহর থেকে। প্রায় সবাই ভদ্রঘরের। না লাশ, না কোনো হুমকি চিঠি। পুলিশ-প্রশাসনের কপালে চিন্তার ভাঁজ। যদিও এসব নিয়ে ভাবছে না সে। তবু আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরে একটু লাল জলের নেশা করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এখন আবার খদ্দের! যদিও বলছে মামুলি চুলের কাজ। তবে এসব ক্ষেত্রে যে এই মামুলি কাজগুলোই বাড়তে বাড়তে ম্যানি-প্যাডি অব্দি গড়ায় সে ভালোই জানে। ঘড়ির দিকে তাকায় সে। আটটা বাজতে চলল।

- প্লিজ! আমাকে একটা পার্টিতে যেতে হবে এক্ষুনি। শুধু চুলের স্টাইলিং করেই বেরিয়ে যাব।

আগন্তুক আবার হাঁক পাড়ে। গলায় অনুরোধের স্রোত বইছে।

- ওয়েট। আসছি।

মাথাটাকে একবার ঝাঁকিয়ে কর্তব্যে ফেরার পথেই পা বাড়ায় সে। পার্লারের লাল-কালো ড্রেসকোড নিয়ে দরজা খুলে হাসিমুখে স্বাগত জানায় খদ্দেরকে।

- ভেরি সরি। কিন্তু আমাকে প্রায় বাধ্য হয়েই আসতে হল। কর্পোরেট পার্টি, বুঝতেই পারছেন।

নীল রেনকোট চুঁইয়ে জল পড়ছে। আগন্তুক বেশ কাঁচুমাচুভাবেই নিজের অস্বস্তির কথা জানায়।

- ইট হ্যাপেনস। ভেতরে আসুন।

ভদ্রমহিলা ভেতরে ঢুকে যায়। পার্লারের মালকিন দরজা ভেতর থেকে আটকে দেয়।

- আমাকে একটু সাহায্য করবেন রেনকোটটা খুলতে?

- নিশ্চয়ই।

মিনিট তিনেকের প্রচেষ্টায় দু'জনে মিলে রেনকোটটা খুলে ফেলে। পার্লারের মেয়েটি, যার বুকে নাম লেখা আছে মিস সুচরিতা দাশগুপ্ত, সে রেনকোটটাকে পাশে রেখে খদ্দেরকে চেয়ারে বসতে বলল। আড়চোখে সে দেখে নিল মহিলার চুল। অসম্ভব সুন্দর চুলের অধিকারিণী ভদ্রমহিলা। খুলে ফেললে নির্ঘাত কোমর ছাড়াবে এই চুল।

সুচরিতা জিজ্ঞেস করল,

- সো, চুলে কী করবেন ম্যাডাম?

- প্লিজ, 'ম্যাডাম' নয়। এভাবে শেষ মুহূর্তে এসে যে আপনাকে বিড়ম্বনায় ফেলেছি তাতে নিজেরই লজ্জা লাগছে। আমার নাম সুমিত্রা, ছোটো করে সুমি। এটাই ডাকুন, ডোন্ট বি সো প্রফেশানাল। আমি প্রায় বাল্যবন্ধুর মতোই আপনার সাহায্য নিয়ে ফেলছি যে।

বলেই মিষ্টি হাসলেন। সুচরিতাও না হেসে পারল না। সে এটুকুতেই বুঝতে পেরেছে যে ভদ্রমহিলা বেশ মিশুকে।

- বেশ, সুমি বলুন কীভাবে আপনার চুলকে আরও অ্যাট্রাক্টিভ করতে পারি।

বলতে বলতেই হাইড্রলিক চেয়ারটাকে বসার উপযোগী করে সুমিত্রাকে বসার আহ্বান জানাল সে।

- ঠিক বুঝতে পারছি না। চুল তো বেশ লম্বা হয়ে গিয়েছে। কেটে ছোটো করে ফেলব?

হাইড্রলিক চেয়ারে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করে সুমিত্রা।

- আরে সে কী! চুল কাটবেন কেন? কী সুন্দর চুল আপনার!

চুল কাটার কথা শুনে প্রায় আঁতকে ওঠে সুচরিতা। আনমনে চুলগুলোতে হাত বোলায়। কী নরম! কী স্মুদ! ঔজ্জ্বল্য চোখে পড়ার মতো। রেড ভেলভেট শেডে কোনো রাজকন্যার চুল মনে হচ্ছে যেন! ভদ্রমহিলা নিশ্চিত সুন্দরী, কিন্তু তার চেয়েও বেশি সুন্দর তাঁর চুল।

- তাহলে কী করা যায়?

সুমিত্রা আয়নায় আড়চোখে সুচরিতাকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল। চটকা ভাঙল সুচরিতার।

- সুমি, আমি যা দেখতে পাচ্ছি আপনার চুলগুলো ওয়েভি সাইড পনিটেইল হয়ে আছে। পার্টির জন্যে এটাও খারাপ না।

- না না, আমার একদম ভালো লাগছে না। অন্য কিছু বলুন।

একটু ভেবে নিল সুচরিতা। অন্য কিছু যে খদ্দের চাইবে সে জানত। দু'মিনিটে আর যা'ই হোক, মেয়েদের সাজ হয় না। তার ওপর চুলের কাজ। আজকে ফিরতে রাত হবে বোঝা যাচ্ছে। মুখে বলল,

- বেশ, তবে একটু মেসি করে ওয়েভি পনিটেল করে দিচ্ছি। সঙ্গে কার্লস। রেড ভেলভেট টেক্সচারে এটা খুব মানাবে আপনাকে।

- সেই পনিটেল?

- বাট দিস ইজ মেসি অ্যান্ড কার্লি। অসাধারণ লাগবে, ট্রাস্ট মি।

সুচরিতা বুঝল খদ্দের টোপ গিলেছে। এবার কাজটা ঝটপট সেরে বাড়ির পথে। দিনকাল ভালো নয়।

- আচ্ছা সুচরিতা, বাইরে সব এত শুনসান হয়ে যাচ্ছে কেন? শুধু বৃষ্টি, না কি ওই লোক হাপিশ হয়ে যাবার ভয়ে।

- লোক আর কই, হচ্ছে তো মহিলা হাপিশ! তাই তো তাড়াতাড়ি ফিরতে চাইছিলাম।

- আয়্যাম রিয়েলি সরি।

- আরে না না, আপনি ভাববেন না। কাছেই থাকি, তবু উবার নিয়ে নেব।

- কোথায় থাকেন?

এবারের প্রশ্নটা স্বাভাবিক ঠেকল না সুচরিতার কাছে। সুমিত্রার কণ্ঠ এতক্ষণ যতটা মিষ্টি ছিল, এই প্রশ্নটা করতে গিয়ে সেটা নেই। সাধারণ প্রশ্ন নয়, যেন কোথায় থাকা হয় জানতে চাওয়া।

- এই যে, কোথায় থাকেন? কাছে হলে আমার গাড়িতে লিফট দিতে পারি।

এবার আবার সেই মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠ। সুচরিতা আশ্বস্ত হল,

- না না, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। কোনো ড্রিংকস নেবেন?

- বাহ্, সেই ব্যবস্থা আছে নাকি! বড়ো শহরে তো থাকে। এখানে যে থাকবে ভাবিনি।

- আমরা আমাদের সার্ভিসে সকল ব্যবস্থা দেবার চেষ্টা করি। রেড না হোয়াইট?

প্রশ্ন করেই সুচরিতা পার্লারের পেছনের অংশে চলে গেল। সুমিত্রা একটু চেঁচিয়ে বলল,

- রেড, রেড।

সুচরিতা ফিরল হাতে একগ্লাস রেড ওয়াইন নিয়ে। অন্যহাতে ধরা ওয়াইনের আধখালি সবুজ বোতলটা একপাশে রেখে দিল সে। গ্লাসটা বাড়িয়ে দিতেই সুমিত্রা মিষ্টি হাসল,

- থ্যাংকস আ লট।

- ইও'র মোস্ট ওয়েলকাম, সুমি।

হাইড্রলিকটাকে প্রেস করতেই সেটা লম্বা হয়ে গেল এবং সুমিত্রা তাতে রেড ওয়াইন হাতে নিয়ে আয়েশ করে শুয়ে রইল। স্টাইলিংয়ের কাজ শুরু করল সুচরিতা।

- তোমাকে দেখে ভালো লাগল। মর্ডান জেনারেশানের মেয়েরা শুধু কাজ করছে না, বরং কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স নিয়েও ভাবছে। একা মেয়ে, অবলা মেয়ে ইত্যাদি বিশেষণকে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে। বাই দ্য ওয়ে, আর ইউ সিঙ্গল?

সুমিত্রার প্রশ্নে হালকা হেসে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দেয় সুচরিতা। তার হাতে ব্রাশ, রোলার, কাঁচি নিয়ে সে এখন ব্যস্ত।

- খুব ভাবাচ্ছে জানো সুচরিতা, খুব ভাবাচ্ছে।

- কী ভাবাচ্ছে? হেড মাসাজ করে দেব? চিন্তা দূর হবে।

- উঁহু, দূর হবে বলে মনে হয় না। নেক্সট ভিকটিম কাকে করা যায়?

মন দিয়ে স্টাইলিং করতে থাকা সুচরিতা থামল। কী বললেন ভদ্রমহিলা? ভিকটিম?

- মানে?

আয়নায় সুমিত্রার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

- মানে? এই যে মেয়েগুলো ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে, তারপর কে ভ্যানিশ হবে ভাবছি।

- ওহো! তাই বলুন।

আবার কাজে মন দিতে গেল সে। সুমিত্রা গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল,

- বা কাকে ভ্যানিশ করা যায় ভাবছি।

এবার হাতের কাজ থামাল সুচরিতা। ব্যাপারটা তার কাছে সুবিধের ঠেকছে না। ভদ্রমহিলা অন্য সব খদ্দেরের থেকে আলাদা। কথাবার্তাতেও রহস্যময়ী। ঠিক কীসের ইঙ্গিত করছেন এবার জানতে হবে। সে সরাসরি তাকায়,

- আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন বলুন তো? কে কাকে ভ্যানিশ করবে?

- আপনি ভয় পাচ্ছেন সম্ভবত।

এবার সুমিত্রা চোখে হাসল।

- হ্যাঁ, পাচ্ছি। আপনি রহস্য না করে কী বলতে চাইছেন বলুন। নয়তো এই মুহূর্তে...

ঢোঁক গিলল সুচরিতা।

- আহা, এত ভয় পাবার মতো কিছুই তো বলিনি এখনও... বা আমার ব্যাগে রাখা অস্ত্রটাও দেখাইনি আপনাকে। মাথার মাসাজটা শেষ করুন। বাকি স্টাইলিং হয়ে গেলেই আমি চলে যাব।

ওয়াইন গ্লাসে আবার চুমুক। নিস্তব্ধ এলাকার এক বিলাসবহুল এসি কামরায় দাঁড়িয়ে চুমুকটাও সশব্দে শোনা যায়। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে সুচরিতার কপালে। সে এগিয়ে যায়, আবার কাজে মন দেবার চেষ্টা করে।

কিন্তু হাত কাঁপছে। অপরদিকে শান্ত সমাহিত এক ভাবমূর্তি, যেন গত দু'মিনিটে সেরকম উত্তেজক কোনো কথোপকথন হয়ইনি।

- আপনি ভয় পেলেন কেন বলুন তো? কী ভাবলেন হঠাৎ যে ঘামছেন?

সুচরিতা আয়নায় নিজেকে দেখল। সত্যি দরদর করে ঘামছে সে। ঘামটা মুছে নিয়ে যথাসম্ভব শান্ত হয়ে বলল,

- আমি ভেবেছিলাম...

- কী ভেবেছিলেন? আমিই সেই খুনি যে শহরের মেয়েদের মেরে ফেলছি?

- খু-খুন? কিন্তু এখনও তো জানা যায়নি তারা জীবিত কি মৃত। শুধুই তাঁদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি কী করে জানলেন খুন?

সুচরিতা আরও ভয় পেল। এই ভয়ের মধ্যেও সে বারবার সুমিত্রার চুলে হাত বুলিয়ে চলেছে, যেন অজান্তেই। অভ্যাসবশতই তার দুই হাত সুমিত্রার কেশসজ্জা করে চলেছে। আর তখনই সুমিত্রা ঘুরে খপ করে তার হাতটা ধরল।

- আমি, আমি সব জানি। উফ্, আপনার হাতটা কী রুক্ষ! কেন বলুন তো? এই প্রফেশনে তো হাত রুক্ষ হবার কথা না। এর আগে কী করতেন আপনি?

হাতে ওয়াইন গ্লাস নিয়ে অন্যহাতে সে চেপে রেখেছে সুচরিতাকে। সুচরিতা ভয়ে প্রায় কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে চোখ রাখার সাহসটাও যেন হারিয়েছে সে। এভাবে তাকে যে আততায়ীর কবলে পড়তে হবে কোনোদিন ভাবেনি সে। কোনোক্রমে বলল,

- ডা-ডাক্তার ছিলাম। সার্জন।

- ছিলাম? এখন নেই কেন?

- আমার লাইসেন্স ব্যান করা হয়েছে।

- ইন্টারেস্টিং। একজন ডাক্তার যে কিনা এখন বিউটি পার্লার চালায়। খুব ইন্টারেস্টিং। আমার নেক্সট ভিকটিম হবার পক্ষে আদর্শ।

হেসে ওঠে সুমিত্রা। হাইড্রলিক থেকে নেমে ওয়াইন গ্লাস নিয়ে পার্লারময় হেঁটেচলে দেখতে থাকে সে। এককোনায় চুপ করে দাঁড়িয়ে

থাকে সুচরিতা। মাথা তার নীচু। চুলে মুখ ঢেকে যাবার ফলে তার মুখের অভিব্যক্তি বোঝা যাচ্ছে না।

- কী হল ডাক্তারসাহেবা, হবেন আমার নেক্সট ভিকটিম?

সুমিত্রা সুচরিতার দিকে তাকাল। সুচরিতার মুখ এখনও নীচু। সে অবস্থায় ধীরে ধীরে সে কিছু বলল, কিন্তু শোনা গেল না।

- কী বললেন? শুনতে পেলাম না।

সুচরিতা এবার ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল। সুমিত্রা দেখল ইতোমধ্যে চোখে রক্ত নেমেছে তার। ঈষৎ লাল চোখে সে তাকিয়ে আছে সুমিত্রার দিকে। সুমিত্রা ভয় পেল না।

- বেশ, বেশ। কিছু বললেন আমাকে।

সুচরিতা এবার স্পষ্ট কেটে কেটে উত্তর দিল,

- কে কার ভিকটিম হবে, আর অল্প সময়েই বোঝা যাবে।

হাসল সে। কথাটা শুনে দমে না গিয়ে হাসল সুমিত্রাও।

- এটার জন্যেই তো অপেক্ষা করছিলাম। গল্পটা শুরু করুন তবে।

সুচরিতা চেয়ে থাকল, উত্তর দিল না।

- কী হল বলবেন না?

- আপনি কে?

সুচরিতা প্রশ্ন করল এবার।

- আর আমি কে? আমি বলির পাঁঠা। যে পাঁঠাকে বাঘের সামনে ঝুলিয়ে বাঘ ধরার ফাঁদ সাজায় শিকারির দল। তবে একটাই পার্থক্য। সে পাঁঠার শিকার হয়ে যায় আর সে নিজে থেকে তার মাথাটাই লাগায় না। আমি মাথা লাগিয়েছিলাম।

ওয়াইন গ্লাসটা শেষ করে পাশে রেখে দিল সুমিত্রা।

- মাথা লাগিয়ে কী জানতে পারলেন?

সুচরিতার আবার জানতে চায়।

- যাহ্! ভেবেছিলাম তো আমি ইন্টারোগেট করব। উলটে আমাকে করছেন যে! তাহলে বলি, জানতে পেরেছিলাম সব ভিকটিম কখনও না কখনও আপনার এই বিলাসবহুল পার্লারে আনাগোনা করেছে।

- তাতে কী প্রমাণিত হয়?

- কিছুই হয় না বলেই তো এই পাঁঠার বেশে আপনার কাছে আমার আসা। আমার ধারণা ওঁরা সবাই ভ্যানিশ হবার আগেও আপনার কাছেই এসেছিলেন।

এবারের কথাটা সামান্য জড়িয়ে বলল সুমিত্রা। এমনকি কতকটা গুছিয়েও বলতে পারল না। ব্যাপারটা লক্ষ করল সুচরিতা।

- হুম! তবে শুধু ধারণার বশে এতকিছু?

- হ্যাঁ রে, ভাই। আমাদের প্রফেশানে এমন অনেক কিছু করতে হয়। তার ওপর আনঅফিশিয়াল দায়িত্ব। নইলে কী আর একা আসি! তবে চালাকি নয়। গল্পটা শুরু করো।

পাশে রাখা অন্য হাইড্রলিক চেয়ারে বসে সুমিত্রা। সার্ভিসিং রিভলভারটা বের করে পাশের টেবিলে রাখে।

- কীসের গল্প? সেরকম কোনো গল্প তো নেই।

সুচরিতা এখন আরও সংযত, যেন এক হিমশৈল যা সাধারণ উষ্মা প্রকাশে গলে যায় না।

- ডাক্তারি ছেড়ে পার্লার কেন?

- বলব না। ইচ্ছে করছে না।

- এতগুলো মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না। এ নিয়ে কী বক্তব্য?

- দুঃখজনক ঘটনা।

সুমিত্রার ধৈর্য এবার জবাব দিচ্ছে। অনেক হল সৌজন্যমূলক ব্যবহার, এবার পুলিশি কায়দায় নামতেই হচ্ছে ভেবে সুমিত্রা চেয়ার থেকে উঠতে গেল। আগেরবার কথা হালকা জড়িয়ে গিয়েছিল, এবার উঠতে গিয়ে মাথাটাই টাল খেয়ে গেল। সুমিত্রা বসে পড়ল। মাথাটা ঘুরছে, আর সেটা সাধারণ ওয়াইনের নেশায় করা ঝিম ঝিম ভাব নয়। সে বুঝতে পারছে এবার ব্ল্যাক আউট হবে। সুমিত্রা সমস্ত শক্তি একত্র করে আর একবার উঠতে গেল। এবার আর টাল সামলাতে পারল না। চেয়ার থেকে উলটে পড়ল লাক্সারিয়াস টাইলসের মেঝেতে।

সুচরিতা চুপচাপ সমস্তটা দেখছিল। অনেকটা সময় আগেই এরকম হবার কথা ছিল। মানসিক গড়নে শক্ত বলেই হয়তো সুমিত্রার ওপর মেডিসিনের প্রভাব দেরিতে হল।

আর দেরি করল না সুচরিতা। সুমিত্রার বেহুঁশ শরীরটাকে টেনে হাইড্রলিকে বসিয়ে দিল। চটপট গ্লাভস পড়ে সুরক্ষিত ড্রয়ার থেকে বের করল সার্জিক্যাল ছুরি, কাঁচি, ইনজেকশনের প্যাকেট, তুলো ইত্যাদি নানান জিনিসপত্র। লোকাল অ্যানাস্থেটিক পুশ করল সুমিত্রার শরীরে। জ্ঞান ফিরতে ফিরতে আরও কিছু সময় পাওয়া যাবে তাতে।

এবার সে শুরু করল এক অদ্ভুত কাজ। বিউটি পার্লারের ঝাঁপ

ফেলে দিয়ে পার্লারটাকে কিছু সময়ের মধ্যেই সে বদলে ফেলল ছোটোখাটো অপারেশান থিয়েটারে। চড়ামাত্রার আলো এসে পড়ছে সুমিত্রার মুখের ওপর। মাস্ক পরে সার্জিক্যাল ছুরি নিয়ে এগিয়ে এল সুচরিতা। এই মেয়েকে দেখে আর বিউটিশিয়ান মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে ভয়ংকর এক সার্জন তার পরবর্তী শিকারে নেমেছে।

ধীরে ধীরে সে দাগ কাটল সুমিত্রার সম্পূর্ণ মাথায়। যে অংশে চুল আছে সে অংশের আউটার বর্ডারে দাগ কাটা হল। এবার ধীরে ধীরে সার্জিক্যাল ছুরি দিয়ে সেই দাগকাটা অংশ বরাবর কাটা শুরু করল সে। ছুরির প্রথম টানের পরেই সুমিত্রার ফর্সা কপাল বেয়ে রক্তের ধারা নেমে এল। খুব সন্তর্পণে এবং পাকা হাতের জাদুতে সুচরিতা নিপুণভাবে ছুরি চালাতে লাগল। মানুষের চুল চামড়ার যে স্তর পর্যন্ত আছে সেই স্তর অবধি সে কাটতে লাগল। যার ফলে চামড়া সহ চুল ধীরে ধীরে পরচুলার আকারে উঠে আসতে লাগল। রক্তে ভেসে যেতে লাগল চারদিক। কখনও ছুরি দিয়ে, কখনও হাত দিয়ে টেনে জ্যান্ত শরীর থেকে চামড়া টেনে খুলতে লাগল সুচরিতা। সুমিত্রা জানতেও পারল না। সে এখন গভীর ঘুমে অচৈতন্য। তবে এই ঘুম কাটতে খুব একটা দেরি হবে না। হাত চালায় সুচরিতা। আর মিনিট দশেকের মধ্যেই চামড়া সহ সম্পূর্ণ চুল নিয়ে তার হাতে উঠে আসেবে জ্যান্ত মানুষের আসল পরচুলা। চামড়া বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে মেঝেতে। সুমিত্রার খোলা মাথা যেন সদ্য কাটা রক্তাক্ত তরমুজ।

তুলো দিয়ে সে রক্ত কিছুটা মুছে ফেলে সুচরিতা। মাথায় পট্টি করে দেয়। ইনজেক্ট করে পেইনকিলার। পার্লারের ভেতরের ঘরে চলে যায় সে। সাদা ধবধবে এক ম্যানিকুইন সেখানে তার অপেক্ষা করছে, আকারে ছোটো, গলা অবধি। তবে এতে পরাবার আগে চামড়ায় লেগে থাকা রক্ত পরিষ্কার করতে হবে।

সুচরিতা যখন এসব কাজে ব্যস্ত তখন ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরতে থাকে সুমিত্রার। নেশার ঘোর কাটিয়ে ঘুম ভাঙলে যেরকম মাথা ঝিমঝিম করে এখন এরকম অনুভূতি হচ্ছে তার। ব্যথা সে অনুভব করছে না হাই ডোজের পেইনকিলারের জন্য। অবশ্য এ ব্যথা অনুভবের আগেই...

একটা চিৎকার শুনতে পেল সুচরিতা। সে এই দৃশ্যে অভ্যস্ত। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সে ওই ঘরে। হাত বাঁধা থাকায় কিছুই

করতে পারছে না সুমিত্রা। শুধু আয়নায় নিজের মাথাটা দেখে চিৎকার করছে। অশ্রাব্য গালাগাল দিচ্ছে সুচরিতাকে আর জিজ্ঞেস করছে,

- আমার চুল কোথায়? কোথায় আমার চুল? কী করেছিস তুই... তুই জানিস না তুই কার সঙ্গে...

বাকি কথা সুচরিতা শুনলও না। এইটুকুই শুনেছে কি না কে জানে। চুপচাপ এগিয়ে গেল সুমিত্রার দিকে। কানের কাছে গিয়ে বলল,

- এটাই তোমার সব প্রশ্নের উত্তর। এটাই আমার শখ। আমার নিজের চুল আমার পছন্দের নয়। বাকি সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুব খুব পছন্দের। তাই পারফেক্ট হতে চাই। আর সবার সব চুলে সবরকম স্টাইল সম্ভব নয়।

আরও কিছু হয়তো বলতো সে, কিন্তু সুমিত্রা আবার গালাগাল আর চিৎকার শুরু করল।

- তোকে গুলি করে মারব আমি! শালি, তুই একজন পুলিশের...

সুচরিতা নাক কোঁচকাল। বড্ড আওয়াজ হচ্ছে ঘরটায়। সুমিত্রার কথা বলার ফাঁকেই তার জিভটাকে টেনে বের করল সে। ছটফট করছিল সুমিত্রা। গায়ের জোরে তাকে থামিয়ে পাশে তৈরি করে রাখা একটা ইনজেকশন পুশ করে দিল জিহ্বায়। আর অল্প সময়, চিৎকার থেমে গেল।

একটা লাইট মিউজিক অন করল সুচরিতা। ভেতর ঘর থেকে ম্যানিকুইনের মাথায় রাখা সদ্য কাটা জ্যান্ত পরচুলাটা পরে এল এই ঘরে। হাতে রেড ওয়াইনের গ্লাস। আয়নার সামনে এসে সে দেখল নিজেকে। প্রাণভরে নিজেকে দেখার পর শুধু একবার হাসিমুখে বলল,

- বিউটিফুল!

পেছনে একটা চেয়ারে গায়েব হবার অপেক্ষায় সুমিত্রার লাশ। এদিকে গান বাজছে— *ক্যায়সি পহেলি জিন্দেগানি...*

চিকেন রোস্ট
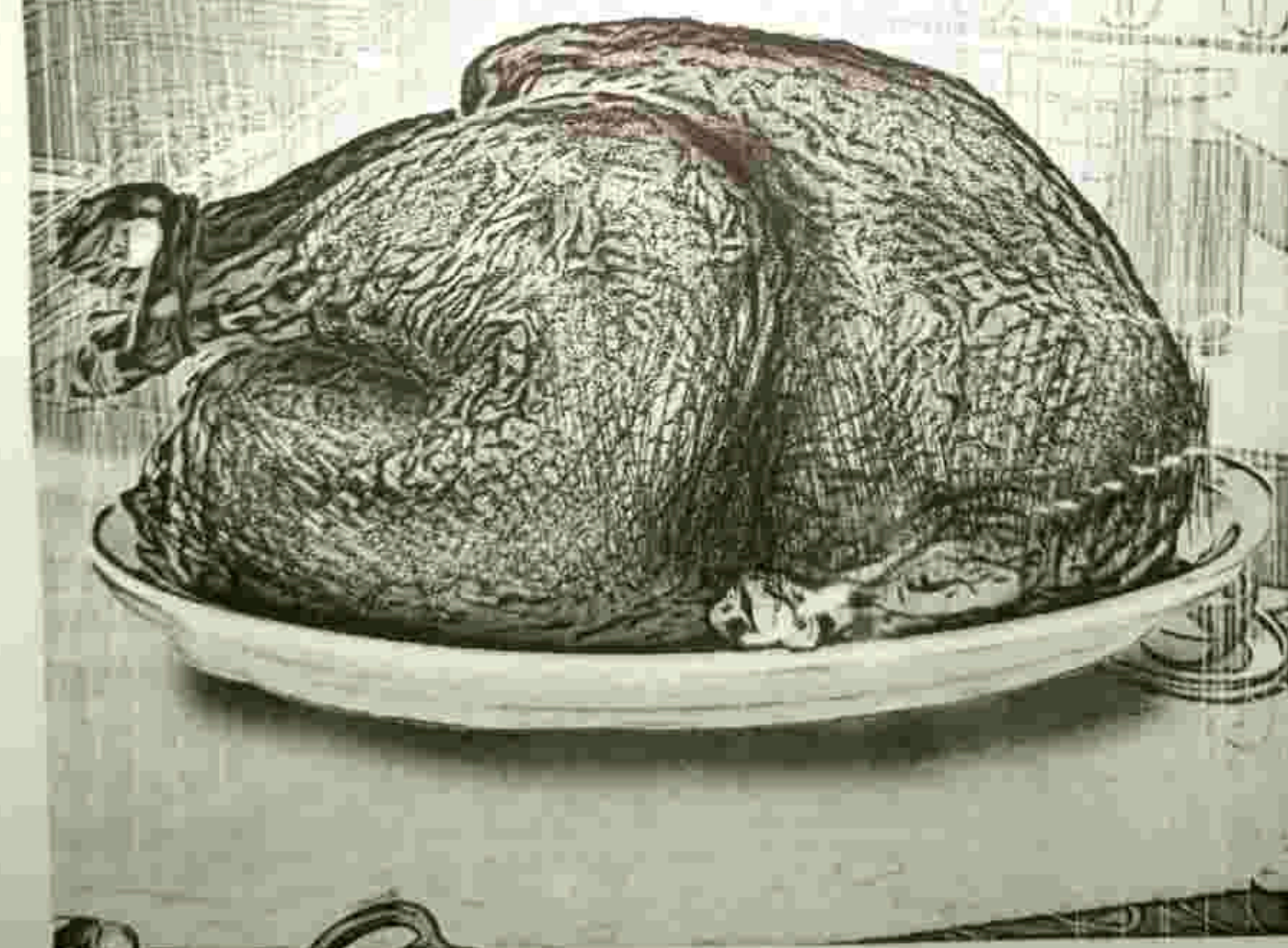
লকেট বাড়িতে আসার পর ববি কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। ববির হাজব্যান্ড কৃশানু ইউএস-এ কর্মরত। ববি কলকাতায় মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেনি। যদিও মোটা বেতনের কর্পোরেট চাকরি একটা কারণ, ছোটোবেলায় কাটানো বালিগঞ্জের ঢাউস বাংলো অন্যটা। বাড়িতে এতদিন রান্নাবান্নার লোক আর একজন মাসি রেখেই চলে যেত। কিন্তু রিসেন্টলি ছোটোছেলে হবার পর থেকেই লকেটের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিল ববি। এমনিতেই অর্চি বড়ো হচ্ছে, ছয় বছর বয়স। তার ওপর এখন ঋষি এল। যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে গেলে এবং মাসিক খরচ কমাতে গেলে লকেটের বিকল্প কিছুই ছিল না। কোম্পানি থেকেও বলেছিল,

- বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো থেকে শুরু করে রান্না করা, বাসন মাজা, আপনাকে তৈরি করা— সবকিছু করতে পারে আমাদের রোবো মম।

- দুধ খাওয়ানো?

ববির প্রশ্নে মহিলা হেসে বলেছিলেন,

- বটল ফিডিং।

কৃশানু বলেছিল,

- দেখো, ইউএস-এ এসব এসেছে বহু বছর। ২০৫০ সালে দাঁড়িয়ে এখন রান্না করা, ঘর পরিষ্কার এটসেট্রার আলাদা আলাদা লোক রাখা মানেই পয়সা নষ্ট। আমার আপত্তি নেই। তুমি দেখে নাও।

হলুদ সুতি শাড়ি পরা, সুশ্রী মুখের রোবো মমকে দেখেই পছন্দ হয়েছিল ববির। তারপর ডাউন পেমেন্ট করে দেয় ববি। ইএমআই-এ ঘরে চলে আসে ফুলটাইম রোবো মম।

কোম্পানি শুধু বলেছিল,

- ব্যাটারিটা যাতে ফুল এমটি যেন না হয়, সেদিকে একটু লক্ষ রাখবেন। অবিশ্যি রোবো মম নিজেই নিজেকে চার্জ দেয়, তবুও। আর বাজ পড়লে এই মেশিন অনেক সময় ভুল কমান্ড নেয়। আপডেট চলে এলে আমরাই অটো আপডেট করে দেব। এছাড়া আর কোনো সমস্যা নেই।

লকেট নামটা ববিই রেখেছে। যার পেছনে একটা সকেট আছে এবং গলার পেছনে ইলেকট্রনিক তার প্যাঁচানো, সেই রোবোটের নাম লকেট রাখাই যায়। লকেট গৃহকর্মে নিপুণা, চটপটে, অফিস আওয়ার্সে একইসঙ্গে ববিকে প্রয়োজনীয় জিনিস এগিয়ে দেওয়া, অর্চিকে স্কুলের জন্য তৈরি করা ও ঋষিকে সামলানো— এ মানুষের কম্মো নয়।

তবে ববি অবসর সময়ে লক্ষ করেছে, লকেটের মধ্যে সত্যজিৎবাবুর অনুকূলের কোনো গুণাবলি নেই। অনুভূতিহীন একটা যন্ত্র এই লকেট। শুধু কাজ করতে জানে এবং অবসরে নিজেকে নিজেই চার্জ দেয়। কাজের কথার বাইরে একটা শব্দ খরচ করে না সে।

ববি বৃষ্টির মরশুম আসার পর তক্কে তক্কে আছে। লকেটকে নানাভাবে পরীক্ষা করছে। কিন্তু কোম্পানির সাবধানবাণীকে সম্পূর্ণভাবে মিথ্যে প্রমাণ করেছে লকেট। যত বৃষ্টিই হোক, যত বাজই পড়ুক, লকেট আদেশ পালনে কোনো ভুল করে না। একসময়ে ববি প্রায় নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে।

সেদিন সন্ধে থেকে খুব বৃষ্টি। অর্চি স্কুল থেকে ফিরেছে অনেকক্ষণ। এখন বসে বসে বৃষ্টি দেখছে। আজ নাইট শিফট আছে ববির। ঋষি এখনও ঘুমে কাদা।

- লকেট?

- হ্যাঁ, বলুন।

- আমি কাল সকাল ফিরব। ফ্রিজে আস্ত চিকেন রাখা আছে, অর্চি রোস্ট খাবে বলেছিল। করে দিয়ো।

ব্যাগ গোছাতে গোছাতেই ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছিল ববি,

- আর অর্চিকে হোমওয়ার্কে হেল্প করে দিয়ো। ঋষির ঘুম ভাঙলে তাকে খাইয়ে দিয়ো। ব্রেস্ট মিল্ক পাম্প করে রেখে দিয়েছি ফ্রিজে। বুঝেছ?

- হ্যাঁ, বুঝে গেছি।

মিষ্টি হেসে প্রথাগত যন্ত্রমানবীর মতো উত্তর দিয়েছিল লকেট। ফোন আসে। রিসিভ করে ববি,

- হ্যাঁ, কৃশানু, আমি বেরোচ্ছি। তুমি মেইলটা আমায় পাঠিয়ে... আর শোনা যায় না। ফোন কানে দিয়ে ববি বেরিয়ে যায়।

লকেট ইনস্ট্রাকশন অনুসারে কাজ করতে থাকে। রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রিজ থেকে চিকেন বের করে আনে, ছাল ছাড়ানো ধুয়ে রাখা সাদা আস্ত মুরগি। বরফ ঝরার জন্য বাইরে রেখে ম্যারিনেট করার বন্দোবস্ত করতে থাকে সে। বাইরে বৃষ্টি বাড়ছে।

- লকেট, লকেট?

অর্চি ডাকছে, মশলা বানানো মাঝপথে থামিয়ে হাত ধুয়ে লকেট অন্য ঘরে যায়।

- হোমওয়ার্ক...

লকেট বই এবং খাতা নিয়ে বসে পড়ে অর্চির সঙ্গে। বাইরে বৃষ্টির ছাঁট বাড়ছে, বাজ পড়া শুরু হয়ে গেছে। ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে জানালার শার্সি।

তিনমাসের ঋষির কান্নার শব্দ শোনা যায়।

মাঝপথে হোমওয়ার্ক থামিয়ে ঋষির ঘরে ছোটে লকেট। ডায়পার চেঞ্জ করিয়ে ফ্রিজ থেকে বের করে আনে ব্রেস্ট মিল্ক। খাইয়ে দেয় ঋষিকে। ঋষির তন্দ্রা কাটেনি, আবার ঘুমিয়ে পড়ে সে।

- লকেট, আমার দেরি হচ্ছে। আজ অনেক হোমওয়ার্ক। প্লিজ কাম ফাস্ট।

ঋষিকে ঘুম পাড়িয়ে আবার অর্চির ঘরে দৌড়ায় লকেট। তখুনি একটা বীভৎস শব্দে দালান-কাঁপানো বাজ পড়ে। মুহূর্তের জন্য থেমে যায় লকেট। চার্জ কমে আসছে, বিপ বিপ শব্দ শোনা যাচ্ছে। এখন চার্জ দেবার সময় নেই, ব্যাটারির পাওয়ার ব্যাকআপ বাড়িয়ে দেয় সে। ইমারজেন্সি থেকে চার্জ তুলে নেয় লকেট। কিছু অ্যাপ্লিকেশন অফ হয়ে যায়।

এক ঘণ্টা কাটে, কাচের জানালা দিয়ে দেখা যায় কালো আকাশে ইন্দ্রের বজ্রের মতো বিদ্যুৎশলাকা ফুটে উঠছে বারেবারে। এরই মধ্যে হোমওয়ার্ক শেষ করেছে লকেট। মাঝে দু'বার ছুটতে হয়েছে কিচেনে এবং ঋষির ঘরে।

- অর্চি, তুমি অপেক্ষা করো। আমি তোমার চিকেনটা রোস্টের জন্য মাইক্রোওয়েভে বসিয়ে আসছি।

- ফেরার পথে দুধ এনো, খাব। আর ঋষির ঘরে জানালা বন্ধ আছে কি না দেখে নিয়ো। আর শোনো, তোমার বিপ বিপ শব্দ আবার শুরু হয়েছে। ব্যাটারি নেই বোধহয়। চার্জ দাও।

অর্চি এত ইনস্ট্রাকশন একসঙ্গে দিল যে প্রায় ব্যাটারি নিঃশেষিত লকেট কোনোক্রমে সবগুলো আলাদাভাবে বুঝতে পারল।

ধীরে ধীরে সে এগিয়ে গেল রান্নাঘরে। মাঝে ফিরে এল ঋষির কাছে। আবার রান্নাঘর, আবার ঋষি।

রোস্টের জন্য মুরগিকে মাইক্রোওয়েভে রাখল। জানালা বন্ধ করে, ঋষিকে আর একটু খাইয়ে নিপাট ভাঁজ করা চাইল্ড বেডে শুইয়ে চাদরে ঢেকে দিল।

- আজ ইচ্ছে করছে না। রোস্ট খাব না। আমি শুয়ে পড়ছি।

অর্চির গলা, লকেট বুঝল কাজ শেষ হয়েছে তার। রোস্টেড চিকেনটা বের করে টেবিলের ওপর রেখে ঢেকে দিল সে।

নিজেকে নিয়ে চার্জে বসিয়ে দিন শেষ হল তার।

***

ক্যাব থেকে নেমে ফোনে কানে দিয়ে ঘরে ঢুকছে ববি। রোবো মম কোম্পানির ফোন। তা থেকে স্বয়ংক্রিয় ভয়েসে কথা শোনা যাচ্ছে। কাজের সুবিধার্থে লাউডস্পিকারে রাখল ববি।

লকেট দরজা খুলে দিয়েছে।

- গুড মর্নিং, ম্যাম।

- গুড মর্নিং। অর্চির কী খবর? ঋষি রাতে ক'বার উঠেছে?

- অর্চি রাতে খায়নি। হোমওয়ার্ক শেষ করে শুয়ে পড়েছে।

- সে কী? আর ঋষি?

- সে একবার উঠেছিল। খাইয়ে শুইয়ে দেবার পর আর ওঠেনি।

- মানে? এতটুকু বাচ্চা ওঠেনি!

বলেই ব্যাগ রেখে ববি ছুটল ঋষিকে যে ঘরে রাখা হয় সেখানে। মেঝেতে চারদিকে ছোটোখাটো খেলনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, ববি এক-দুটোকে মাড়িয়ে চলে গেল যেন। আর গিয়ে যা দেখল তাতে বাকশক্তিরহিত হয়ে গেল।

চাইল্ড বেডে চাদর গায় দিয়ে শুয়ে আছে পালক ছাড়ানো সাদা ধবধবে একটা আস্ত মুরগি। গায়ে ম্যারিনেশানের মশলা লেগে আছে।

বিছানা ধরে বসে পড়ে ববি। ফোনের লাউডস্পিকারে এখনও শোনা যাচ্ছে রোবো মম কোম্পানির কথা।

- প্রিয় গ্রাহক, আমরা রোবো মমকে আপডেট করে ফেলেছি।

বৃষ্টির দিনে বাজ পড়লে সে আগের মতো ভুল করবে না। শুধুমাত্র ব্যাটারি কম থাকাকালীন একসঙ্গে অনেক অর্ডার এলে সে গুলিয়ে ফেলতে পারে, তা'ও শুধুমাত্র বজ্রপাতসহ বৃষ্টির দিনেই। একটু খেয়াল রাখবেন, প্রিয় গ্রাহক। ধন্যবাদ।

রান্নাঘরে গিয়ে কেউ টেবিলে রাখা রোস্টেড চিকেনের ঢাকনা খোলার সাহস দেখাতে পারল না।

অস্তিক
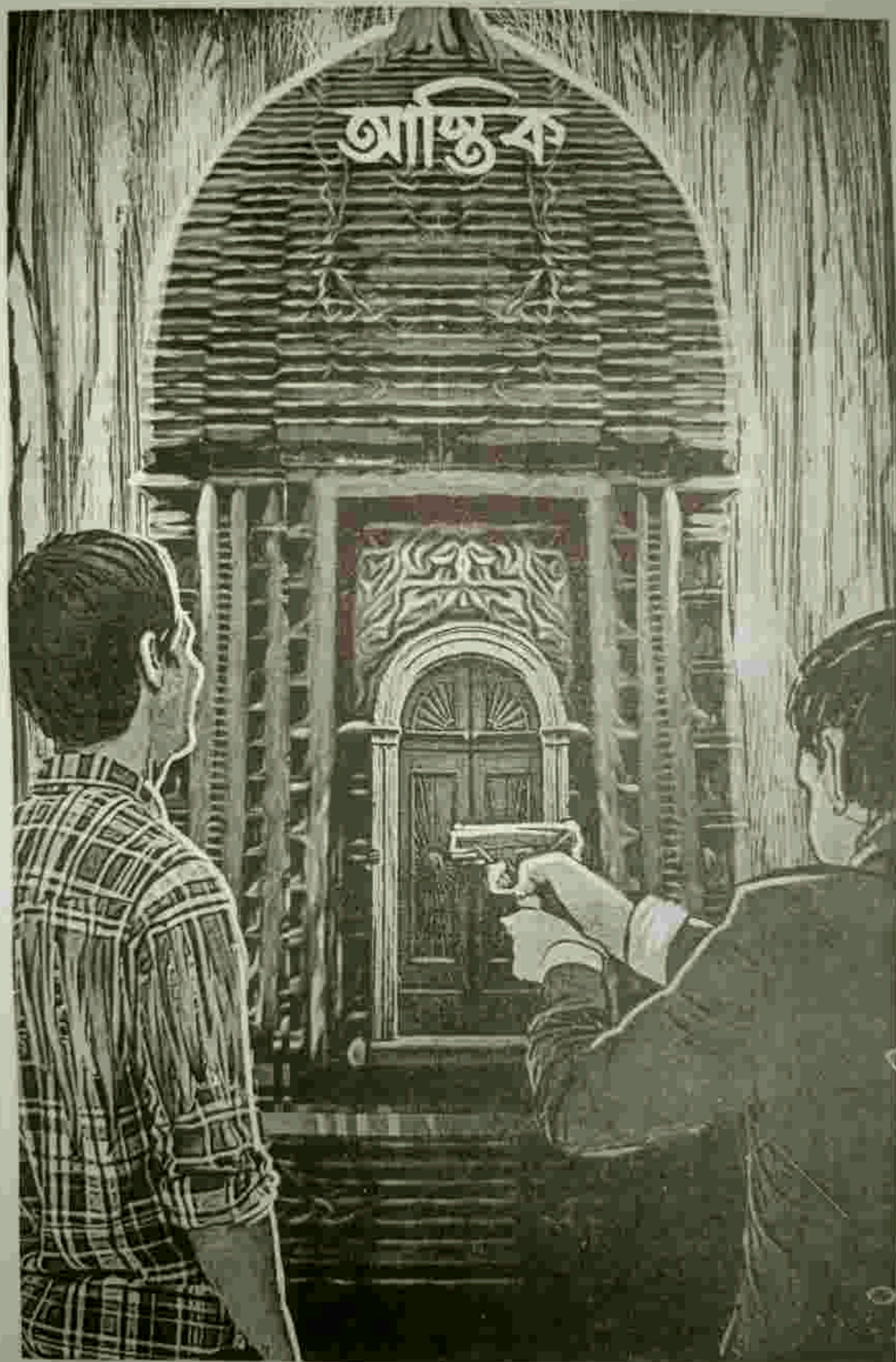
"আততায়ী ওই মন্দিরেই লুকিয়ে আছে। আমাদের যেতে হবে।"

- কোন মন্দিরে?

- আস্তিক মুনির মন্দিরে।

কৃশানু তার টিমের পাঁচজন সেরা অফিসারকে নিয়ে পৌঁছে গেছে গণ্ডাছড়া গ্রামে। খবর আছে শহরে বম্ব ব্লাস্টের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন গা ঢাকা দিয়েছে গণ্ডাছড়ার জঙ্গলে। তাদের সঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়েও আছে যাকে অকুস্থল থেকে পালাবার সময় অপহরণ করেছে তারা। মূলত নিজেদের সুরক্ষার কথা চিন্তা করেই বাচ্চা মেয়েটাকে ঢাল হিসেবে নিয়ে এসেছে ওরা। কৃশানুর কাছে খবর আছে জঙ্গলের ভেতর আস্তিক মুনির মন্দির আছে। তার ভেতরেই আস্তানা গেড়েছে আততায়ীরা।

গণ্ডাছড়া আক্ষরিক অর্থেই অজ পাড়াগাঁ। গাড়ি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে একটা ছোটো টং দোকান। ভেতরের দিকে একটা পাইস হোটেলও আছে। নামেই পাইস হোটেল, আগাগোড়া ভাঙা একটা চাতালের মাথায় টিন লাগিয়ে হোটেল দিয়ে বসেছে মালিক। পাশের টং দোকানটা থেকে একটা পান বানিয়ে মুখে পুরল কৃশানু। আশেপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কয়েক জন চাষা-ভূষা শ্রমিক শ্রেণির লোক কৃশানুদের দেখছে। কৃশানু যথারীতি টিমটাকে লিড করছে, সেটা তার হাবেভাবে স্পষ্ট। সঙ্গে আছে হৃষীকেশ, ইয়াসির, তপন আর সুজয়। প্রত্যেকেই এরকম সার্চ মিশনে পোক্ত। আগেও বহুবার কৃশানু এই টিম নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল আততায়ীর খোঁজে। দেশের জন্য প্রাণ বিপন্ন করে বারংবার খুঁজে বের করেছে আততায়ীদের, জীবিত কিম্বা মৃত। বহুবার অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছে এই টিমের সবাই। তবু যতবার ওপরমহল থেকে ডাক আসে, বেরিয়ে পড়ে তারা।

সামনেই একটা লাঙ্গলে বাঁধা দু'টো গোরুকে থামিয়ে এক ব্যক্তি হোটেলে দুপুরের খাবার খাচ্ছে। দু'একজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে চা খাচ্ছে কিম্বা গল্প করছে বেঞ্চে বসে। সামনে ধু ধু মাঠ। লাল মাটি বাতাসে উড়ছে। সূর্যের আলো তীব্রতর হচ্ছে। দরদর করে ঘামছে শরীর। কিছু দূরে একটা বড়ো চাষের জমি। ফসল তৈরি হতে ঢের বাকি। এক-দুটো কুকুর শুয়ে আছে, গরমে কাহিল।

এরকম এক সময়েই হৃষীকেশকে তার প্রশ্নের উত্তরে কৃশানু বলেছিল,

- আস্তিক মুনির মন্দিরে?

তপন বেশ অবাক হয় শুনে। বলে,

- এ আবার কে? মুনি-ঋষিদেরও মন্দির হয় নাকি!

কৃশানু সিগারেটটা মুখে রাখে। সুজয় তা জ্বালিয়ে দেয়।

- আস্তিক মুনি কে তো জানি না, ভাই। বন্দুক চালাতে জানি। প্রাণ বাঁচাতে হলে আমাদের সেটা জানলেই চলে। হ্যাঁ রে সুজয়, নতুন বিয়ে করেছিস। বন্দুক চলছে তো?

কৃশানু একথা বলতেই বাকিদের মুখে একটা দুষ্টুমির হাসি ফুটে ওঠে।

- স্যার, আপনিও না! সবার সামনে।

সুজয় বেশ লজ্জাই পায়।

- আস্তিক ঋষি কে জানতে চান, স্যার?

যে লোকটা এতক্ষণ বেঞ্চে বসে চা খাচ্ছিল সে'ই কথাটা বলল। সবাই নিজেদের হাসিঠাট্টা থামিয়ে তার দিকে ঘুরে তাকাল। একটা ময়লা ধুতি আর একটা ততোধিক ময়লা ফুলহাতা শার্ট পরে বসে আছে লোকটা। গায়ের রং শ্যামলা, সামনের দাঁতগুলো পান খেতে খেতে কালো হয়ে গিয়েছে। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ।

সুজয় উত্তর দিল,

- না, জানতে চাই না।

কৃশানু ইশারায় বলল,

- ডাক ওকে।

তপন ডেকে নিল লোকটাকে।

- কী করিস?

- আজ্ঞে, গ্রামে পূজা করি স্যার। আমরা সাতপুরুষে পুরুত।

- হুম! বিড়ি খাস?

কৃশানুর কথায় লোকটা হাসল। কৃশানু একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিল লোকটাকে। লোকটা সবার দিকে একবার লাজুক চাউনি দিয়ে লুফে নিল সিগারেট। টং দোকানে বেঁধে রাখা জ্বলন্ত দড়ি থেকে জ্বালিয়ে নিল সিগারেটটা। এ জিনিস যে সচরাচর জোটে না কপালে তা তার সিগারেট টানা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

- গ্রামের সবকিছু চিনিস?

লোকটা মাথা নেড়ে বলে,

- হ্যাঁ স্যার, চিনি।

- আর জঙ্গল? জঙ্গল চিনিস?

- খুব চিনি।

- আস্তিক মুনির পূজা কি তুই'ই করিস নাকি?

লোকটা এবার জিভ কেটে কানে ধরল।

- ছি ছি, স্যার! এ কী কথা কইলেন! আস্তিক মুনি পূজা নেন না। উনি সাপেদের রক্ষা করেন। সাপেরাই তার পূজা করে। মানুষ করে না।

সবাই বেশ অবাক হয়ে শুনল কথাটা। কৃশানু বলল,

- তা আমাদের নিয়ে যেতে পারবে সেই মন্দিরে?

- খুব পারব, স্যার।

- জঙ্গলে কতক্ষণের রাস্তা?

- আন্দাজ দেড় ঘণ্টা লাগবে, স্যার।

কৃশানুরা নিজেরা একটু কথা বলে নিল। একটা সিভিলিয়ানকে নিয়ে মিশনে গেলে সিভিলিয়ানের নিরাপত্তার দায়িত্ব টিমের ওপর থাকে। যেভাবেই হোক তাকে বাঁচাতে হয়। এই হাভাতে লোকটার জন্যেও অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করবে ভারতীয় ফোর্স। কারণ প্রত্যেকটা প্রাণ গুরুত্বপূর্ণ, তার সামাজিক অবস্থান যা'ই হোক না কেন।

- ঠিক আছে। তৈরি হয়ে নাও। আমাদের সঙ্গে জঙ্গলে যাবে তুমি। সুজয়, ওকে একটা জ্যাকেট দিয়ে দে।

- স্যার, বেলা প্রায় শেষ। ভাতটা খেয়ে নিই?

- যাও, একটু তাড়াতাড়ি করো।

শেষ পর্যন্ত যখন তারা রওনা দিল ততক্ষণে সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। যখন তারা পৌঁছেছিল তখন ভরদুপুর। বেলা তিনটে অবধিও সূর্যের তেজ প্রখর ছিল। কিন্তু এখন তাপ কমে আসছে। শীতের দিনে মফস্‌সলি এলাকায় এরকম হয়। জঙ্গলে ঢোকার আগে লোকটা বলল,

- জঙ্গলের ভেতরে কিন্তু আপনাদের মোবাইল কাজ করবে না, স্যার।

- সে কী! কিন্তু আমাদের তো হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে।

কৃশানুর মুখে চিন্তার ভাঁজ দেখে হৃষীকেশ বলল,

- এক কাজ করি স্যার, আমি থেকে যাচ্ছি এখানে। আপনারা

গাছে দাগ কেটে এগোন। যদি হেড কোয়ার্টার থেকে কোনো খবর থাকে আমি আপনাদের দেখানো পথে এগোতে থাকব।

কৃশানু কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল,

- এটাই ঠিক হবে। তুই থাক, হৃষীকেশ। আর শোন...

বলে হৃষীকেশকে নিয়ে একটু আড়ালে গেল কৃশানু,

- অ্যালার্ট থাকবি, এলাকাটা ভালো না।

- নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি। দেখা হচ্ছে আবার।

জঙ্গলের পথে পা বাড়ায় সবাই। হৃষীকেশ চলে যায় সেই জায়গায় যেখানে তাদের গাড়ি থেমে আছে।

জঙ্গল এখানে খুব ঘন। এই বিকেলের আলোর জঙ্গলের ভেতরে পৌঁছতে বেশ কসরত করতে হচ্ছে। চারজন আর্মড অফিসার এক সিভিলিয়ানের দেখানো পথে এগিয়ে চলেছে।

- স্যার, মন্দিরে কী আছে?

- সেটা তোমার না জানলেও চলবে।

- আইচ্ছা, স্যার। তাহলে আস্তিক ঋষির গল্পটা বলি। হাজার হোক আপনারা তো তার সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছেন।

সুজয় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল,

- হ্যাঁ, তাই বলো। শুনতে শুনতে পথ কাটতে থাকুক। অন্তত তোমার প্রশ্নবাণ থেকে বাঁচা যাবে ততক্ষণ।

লোকটা বেশ খুশি হল। একটা কাঠের টুকরো দিয়ে জঙ্গলের ঝোপঝাড় সরাতে সরাতে সে গল্পটা বলতে লাগল। অফিসারেরা সবাই তার পিছু পিছু হাঁটতে থাকল,

- এইটা একটা পৌরাণিক গল্প, স্যার। নাগমাতার নাম তো আপনারা জানেন, কদ্রু। একদা এই নাগমাতা কদ্রুর আদেশ অমান্য করেছিল সাপেরা। তখন মাতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের অভিশাপ দিলেন যে রাজা জনমেজয়ের আয়োজিত যজ্ঞের যজ্ঞাগ্নিতে তারা ধ্বংস হবে। মাতার অভিশাপে সন্তানের ধ্বংসের ঘটনার এর আগে পুরাণে উল্লেখ নেই। যদিও পরবর্তীকালে আরও এরকম কিছু ঘটনা ঘটেছিল, স্যার। সে যাক গে। নাগেদের বংশবৃদ্ধি হবে না জেনে দেবতারা খুশি হলেন বটে, কিন্তু পাশাপাশি দুঃখও পেলেন তারা। নাগকুল সম্পূর্ণভাবে যাতে বিনষ্ট না হয় সেজন্য ব্রহ্মার কাছে তদ্‌বির করলেন তারা। ব্রহ্মা তাদের জানালেন, যেসব নাগ বিষধর ও হিংস্র শুধুমাত্র তারাই

বিনষ্ট হবে। কম বিষধরেরা টিকে যাবে। এরপর আত্মমগ্ন হয়ে ব্রহ্মা আরও বলেন,

"কয়েক যুগ পর নাগকুলে এক অতি শুদ্ধস্বভাবা কন্যার জন্ম হবে এবং তার সঙ্গে এক মহাপবিত্র মানুষের বিবাহ হবে। তাদের আস্তিক নামে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। সে'ই নাগজাতিকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করবে।"

নাগকুল এই ভবিষ্যৎবাণীতে কিছুটা আশ্বস্ত হয়।

বলতে বলতে হঠাৎ লোকটা কাহিনি থামাল।

- কী হল? বেশ তো গল্প চলছে, থামালে কেন?

তপন জিজ্ঞেস করল।

- স্যার, এবার ডানদিকে যেতে হবে।

- আর এই বামদিকের রাস্তাটা?

কৃশানু জিজ্ঞাসু দৃষ্টি রাস্তার দিকে।

- স্যার, মন্দির ডানদিকেই। আসুন আপনারা।

লোকটা ডানদিকে হাঁটতে থাকে। অগত্যা বাকিরাও সেদিকেই পা বাড়ায়। লোকটা আবার বলতে শুরু করে,

- তারপর কয়েকশো বছর কেটে গেল। রাজা পরীক্ষিৎ গেলেন মৃগয়ায়। তাঁর অদৃষ্ট তাকে টেনে নিয়ে গেল ঋষি শমীকের আশ্রমে। আহত হরিণকে তাড়া করতে করতে রাজা পৌঁছে গেলেন সেখানে। ঋষি শমীক তখন ধ্যানমগ্ন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি মৌনব্রত পালন করছিলেন সেই সময়। রাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন হরিণের ব্যাপারে। কিন্তু ঋষিবর স্বভাবতই কোনো উত্তর দিলেন না কারণ, তিনি তখন মৌনব্রতে ছিলেন। রাজা ভাবতেই পারলেন না যে তিনি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করেছেন এবং সে সেটার উত্তর দিচ্ছে না। রাজা বারবার জিজ্ঞেস করেও যখন উত্তর পেলেন না তখন তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। সামনে পড়ে থাকা একটা মৃত সাপকে তিরের অগ্রভাগে পেঁচিয়ে ঋষির গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন। পরবর্তীকালে ক্রোধবশে করা এই কাজের জন্য রাজা খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

- দেরি হল কেন? ঋষি শমীক বদলা নিলেন নাকি?

তপনের প্রশ্নে সবাই হেসে উঠল। লোকটাও হাসল খুব।

- না না স্যার, ঋষি নেননি। নিয়েছিলেন তার পুত্র শৃঙ্গী। শৃঙ্গী

নিজেও মহাতেজস্বী এক ঋষি ছিলেন। আশ্রমে ফিরে সবার মুখে রাজার দ্বারা তাঁর পিতার অপমানের কথা শুনে শৃঙ্গী অস্বাভাবিক ক্রুদ্ধ হলেন। ক্রোধান্ধ হয়ে তিনি বললেন,

"যে ব্যক্তি আমার পিতার গলায় এভাবে সাপ ঝুলিয়ে অপমান করেছে, সাতদিন ও সাতরাতের মধ্যে নাগরাজ তক্ষকের দংশনে তার প্রাণ যাবে।"

- আরিব্বাস! সাপেদের রাজা বুঝি তক্ষক!

সুজয় এটা জেনে অবাক হল।

- হ্যাঁ, স্যার।

- আচ্ছা তুমি বলতে থাকো। এদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না।

কৃশানু গল্পের মাঝে বিরতিতে বেশ বিরক্ত হল। আর তাছাড়া সে জানে যে তার টিমের লোকগুলো কোন লেভেলের চ্যাংড়া। গ্রামের লোক পেয়ে শুধু মজা নিয়ে চলেছে।

- তারপর ঋষি শমীক রাজাকে সাতদিন সাতরাত সাবধান থাকতে বলেছিলেন কারণ, তিনি জানতেন তার পুত্রের অভিশাপ ফলবেই। রাজা বেশ অবাক হয়েছিলেন ঋষি শমীকের এই ব্যবহারে। যাঁকে তিনি অপমান করলেন, তিনিই তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন। যা'ই হোক, রাজা সেইমতো সাতদিন সাতরাতের জন্য স্তম্ভের ওপর নির্মিত এক বাড়িতে আশ্রয় নিলেন।

- সবাই চুপ! একটা গুলির শব্দ পেলাম যেন আমি।

কৃশানু তার টিমকে হঠাৎ বলে উঠল। লোকটা গল্প থামিয়ে দিল।

- আমিও পেয়েছি, স্যার। কিন্তু কোনদিক থেকে বুঝতে পারছি না।

ইয়াসির বলল।

- কিছুক্ষণ এখানেই অপেক্ষা করে আবার এগোব আমরা। পরিস্থিতি বুঝে নিই আগে।

কৃশানুর আদেশমতো সবাই গাছের পেছনে পজিশন নিয়ে নিল। গল্প বলিয়ে লোকটাকে কৃশানু নিজের সঙ্গে রাখল।

- ইয়াসির, রাস্তা মার্ক করে এসেছিস তো? হৃষীকেশ না হলে চিনতে পারবে না।

ইয়াসির মাথা নেড়ে জানায় যে সে করেছে।

প্রায় মিনিট কুড়ি এভাবে থাকার পরেও যখন কোনো উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটল না, তখন কৃশানু আবার এগোবার সিদ্ধান্ত নিল।

- তা তোমার গল্প কোথায় ছিল যেন!

কৃশানুই জিজ্ঞেস করল।

তপন বলল,

- বোধহয় রাজা স্তম্ভের ওপরে ছিলেন।

- না স্যার, রাজা স্তম্ভের ওপরে একটা ছিদ্রহীন বাড়িতে ছিলেন।

- তা বেশ। এবার গল্প আর আমরা একত্রে এগোব। পা চালাও সবাই।

কৃশানুর আদেশমতো সবাই তা'ই করল।

- স্যার, রাজা স্তম্ভের ওপরে বাড়িতে উঠে গেলেন, সেপাই দিয়ে চারদিক থেকে পাহারায় রইলেন। এভাবে একদম নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা করা হল। এদিকে সাতদিনও কেটে গেল। সপ্তম দিন যখন সূর্য অস্ত যেতে আর মিনিট পনেরো বাকি, তখন রাজার সঙ্গে কিছু গ্রামবাসী দেখা করতে এল। সেপাইরা তাদের বাধা দিল। রাজা ভাবলেন, এতদিনে কিছু হল না তো আর এই পনেরো মিনিটে কী হবে! এক সামান্য ফলখেকো ঋষির ভবিষ্যৎবাণীকে তিনি একটু বেশিই গুরুত্ব দিয়ে নিজে কাপুরুষের মতো এখানে বসে আছেন। এসব ভেবে রাজা তাদের ভেতরে আসতে বললেন। তারা নিরীহ গ্রামবাসীই ছিল। রাজাকে ফলমূল উপহার দিয়ে তারা তক্ষুনি চলে গেল। সূর্যাস্ত আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই হয়ে যাবে। রাজা সিপাহিদের ডাকলেন। সবাই এলে সবাইকে ফল দিলেন এবং নিজেও নিলেন। সেপাইরা রাজাকে মিনিট পাঁচেক পর ফল খেতে অনুরোধ করল। রাজা শুনলেন না। দিলেন ফলের মধ্যে কামড় বসিয়ে। ব্যস, ফলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা ছোট্ট কীট। তা দেখে রাজা হেসে কুটিপাটি আর কী! মজা করে নিজের গলার ওপর রাখলেন সেই কীটকে। বললেন,

"এইটাই কি সেই তক্ষক যে আমায় দংশন করবে!"

রাজার কণ্ঠে শ্লেষ ঝরে পড়ল। সবাই এই শুনে হাসতে লাগল। ঋষি শমীকের গলায় যেভাবে মরা সাপ রেখেছিলেন সেই ভঙ্গিতেই তখন রাজার গলার কাছে ছিল সেই ছোট্ট কীট। তবে ছোট্ট কীটের ভয়ানক তক্ষকে পরিণত হতে লাগল কয়েক সেকেন্ড। সবাই ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল এবং দেখল সেই তক্ষক রাজার গলা সহ সম্পূর্ণ শরীর পেঁচিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে তারপর রাজাকে দংশন করছে। মৃত্যু হল রাজা পরীক্ষিতের।

লোকটা কাহিনি শেষ করে দম নিতে থামল।

- চমৎকার পৌরাণিক কাহিনি।

তপন নিজের বন্দুকটার লক বন্ধ করে বলে উঠল।

- কিন্তু আস্তিক মুনি কই এই গল্পে?

কৃশানু অসন্তোষ জানাল।

- এই তো স্যার, বলছি। পরীক্ষিতের পর রাজা হলেন তার বালক পুত্র জনমেজয়। জনমেজয় প্রাপ্তবয়স্ক হলে পর তাঁর কাছে উতঙ্ক নামে এক ব্রাহ্মণ এলেন। এসে জানালেন কীভাবে তক্ষকের কারণে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছে। যদিও ঋষি শমীক ও তাঁর পুত্র শৃঙ্গী— সবার কথাই ঋষি উতঙ্ক বলেছিলেন, তবু জনমেজয় তক্ষক সহ সমস্ত নাগকুলকেই দায়ী করলেন তাঁর পিতার মৃত্যুর জন্য। রাজা জনমেজয় ঠিক করলেন সমস্ত নাগকুলকে ধ্বংস করবেন তিনি। শাস্ত্রবিদরা আলোচনায় জানালেন যজ্ঞকুণ্ডে দগ্ধ করে মারবেন তক্ষক সহ সমগ্র নাগকুলকে। সেইমতো যজ্ঞাদির ব্যবস্থা করা হল। প্রথমেই এক পবিত্র ভূমিখণ্ড নির্দিষ্ট করে তাতে বিশাল যজ্ঞকুণ্ড নির্মাণ করা হল। তারপর শুরু হল যজ্ঞ। অগুনতি পুরোহিত ও ঋত্বিক সেখানে উপস্থিত হলেন এবং ঘৃতাহুতি দিতে থাকলেন। মন্ত্র প্রখর হতে থাকল। কিছু সময় পরে সবাইকে আশ্চর্য করে যজ্ঞকুণ্ডে এসে পড়ল এক বিষধর সাপ। তারপর আরও একটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই যজ্ঞকুণ্ডে ক্রমাগত এসে পড়তে থাকল অগুনতি বিষধর সাপ। রাজা নিজে দাঁড়িয়ে রইলেন। যতক্ষণ না স্বয়ং তক্ষকের মৃত্যু হচ্ছে তিনি এখানেই থাকবেন।

তক্ষক খুব ভয় পেল। সে স্বর্গে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনকে পেঁচিয়ে বসে থাকল। দেবরাজ পড়লেন মহা মুশকিলে। এদিকে মন্ত্রের জোরে দেবরাজ সহ তক্ষককে নিয়ে যজ্ঞকুণ্ডের দিকে রওনা হয়েছে সিংহাসন। আকাশে দেখা যাচ্ছে একটা কালো বিন্দু স্বরূপ এই সিংহাসন। পুরোহিতরা মন্ত্রোচ্চারণ প্রখর করলেন। এমন সময় সেই স্থানে এক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হলেন। প্রহরী ব্রাহ্মণের আদেশ বা অনুরোধ ফেলতে পারত না। তাই তাঁকে ভেতরে প্রবেশ করতে দিল। তিনি রাজার কাছে গিয়ে বর প্রার্থনা করলেন। রাজা তাঁকে কিছু সময় অপেক্ষা করতে বললেন। যতক্ষণ না সর্পবংশকে ধ্বংস করতে পারছেন, রাজা কাউকে কিছু দেবেন না।

এদিকে তক্ষক সহ সিংহাসন একদম কাছে এসে পড়েছে। তখন দেবরাজ ইন্দ্র নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেন এবং নিজের সিংহাসন সহ পুনরায় দেবলোকে ফিরে চললেন। শুধু তক্ষক নিচে পড়তে লাগল। রাজা জনমেজয় এবার অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি বুঝে গেলেন তক্ষকের এবার আর পালাবার পথ নেই। তিনি মহানন্দে ব্রাহ্মণকে বললেন,

"আপনি বর চান, আপনি যা চাইবেন আমি তা'ই দেব।"

ব্রাহ্মণ তখন স্মিতহাস্যে বললেন,

"এই যজ্ঞ বন্ধ হোক।"

ব্যস, সব শেষ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে হোমের আগুন নিভে এল। তক্ষকও তার নিজলোকে ফিরে গেল ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হয়ে। রাজাও সমস্ত অভিশাপ ও আস্তিকের কাহিনি জানতে পারলেন এবং তার ক্ষোভ কমে গেল। প্রাজ্ঞ ঋষি আস্তিক সাপেদের রক্ষা করে ফিরে গেলেন নিজের আশ্রমে। বিনিময়ে কিছুই নিলেন না। স্যার, এই ছিল আস্তিক মুনির কাহিনি।

লোকটা গল্প শেষ করে বেশ গদগদভাবে বলল।

- বাহ্, চমৎকার গল্প তো! আস্তিক ঋষির জন্য সাপ, সাপের বাচ্চা মানে পুরো বংশটাই বেঁচে গেল।

কৃশানু হাঁটতে হাঁটতে বলল।

- হ্যাঁ, স্যার। তাই তো সর্পকুল আস্তিক ঋষিকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করে। কথায় আছে না— দোহাই আস্তিক মা মনসা। সে থেকেই তো...

লোকটা বেশ ক্যাবলার মতো হাসল।

- আচ্ছা এতটা রাস্তা চলে এলাম, তোমার নামটাই তো জানা হল না। নাম কী তোমার?

হৃষীকেশ প্রশ্নটা করল।

লোকটা আবার দাঁত বার করল,

- কানাই, স্যার। এই... এই তো মন্দির দেখা যাচ্ছে, স্যার।

কানাই কথাটা বলা মাত্র সবাই থমকে দাঁড়াল।

- ওয়েট অন, টিম। কানাই, এবার আমাদের পেছনে যাও তুমি। বাকি সবাই পজিশান নাও।

কৃশানু অর্ডার দিল।

মন্দির এখনও হাত চল্লিশেক দূরে। ভাঙা একটা মন্দির দালান,

দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে। মাথায় একটা ছোটো গম্বুজ। বহু বছরের পুরোনো মন্দির, তা এক দেখাতেই বোঝা যায়।

- সবাই টু বাই টু ফলো করব আমরা এবং জিগজ্যাগে এগোব। মন্দির থেকে কুড়ি হাত দূরত্বে থেমে আমরা অপেক্ষা করব। কানাই, তুমি একদম পেছনে থাকবে এবং কোনো শব্দ করবে না।

কৃশানুর কথা মতো টিম টু বাই টু করে নিল। বামদিকে প্রথমে সুজয়, তপন; তারপর কিছুটা দূরত্বে কৃশানু, ইয়াসির। একদম পেছনে থাকল কানাই। কানাই ছাড়া প্রত্যেকের হাতেই এখন ভারত সরকারের দেওয়া সার্ভিস পিস্তল। সুজয়, তপন প্রথম এগিয়ে গেল জিগজ্যাগ লাইনে এবং ডানদিকে গিয়ে থামল। নিশানায় মন্দিরকে রেখে চারদিকে সজাগ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। তারপর কৃশানুকে ইশারা করতেই সে আর ইয়াসির আবার একই পদ্ধতিতে ডানদিক থেকে বামদিকে এল। এবার সামনে বামদিকে থাকল কৃশানু, ইয়াসির এবং ডানদিকে সুজয়, তপন থাকল পেছনে। কানাই একদম শেষে যেভাবে ছিল সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। ধীরে ধীরে তারা এগোতে লাগল। আততায়ী যে-কোনোদিকেই থাকতে পারে, মন্দিরে ভেতরে কিম্বা বাইরে। যদি দেখে ফেলে আর ফায়ার করে, তাহলে নির্ঘাত মৃত্যু। কোনো গার্ড নেই যে আততায়ীর গুলি থেকে বাঁচা যাবে। এদিকে এখন সন্ধে হয়ে আসায় আলো একেবারে কমে এসেছে। খুব কষ্ট করে হাত বিশেকের মধ্যে মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে।

মন্দিরের বিশ হাতের মধ্যে এসে কৃশানু সবাইকে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিল। পায়ের নিচে শুকনো পাতার শব্দ হচ্ছে। যদি আততায়ীরা মন্দিরের ভেতরে থাকে তবে আরও এগোলে সেই শব্দ নিশ্চয়ই আততায়ীরা শুনতে পাবে। সেক্ষেত্রে আরও এগোনো খুবই মুশকিল।

- স্যার, এবার?

তপন জিজ্ঞেস করল।

- অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। ওদের তরফে কোনো মুভমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সামনে এগিয়ে গেলে ক্লিয়ার শট পেয়ে যেতে পারে। রিস্ক নেওয়া উচিত হবে না।

ফোন হাতে নিল কৃশানু। নেটওয়ার্ক নেই।

- মোবাইলে কারও নেটওয়ার্ক আছে?

সবাই মোবাইল একবার দেখে নিল.। না কারও নেটওয়ার্ক নেই।

- স্যার, আমি যাব।

কানাই ফিশফিশিয়ে বলে উঠে।

- তুমি? তুমি কীভাবে যাবে? ওরা গুলি করলে শরীরে ক'টা গুলি খাবে তুমি জানো! আধুনিক অস্ত্র আছে ওদের কাছে।

শুনে কানাই হাসল।

- আমি একা মানুষ, মরলেও কী! আপনারা আমার পেছনে আসুন না। আর এই জ্যাকেটটা খুলে যাচ্ছি। নিরীহ গ্রামবাসী ভেবে আমাকে না'ও তো মারতে পারে, স্যার।

কথাটাতেও দম আছে, কানাইয়ের মধ্যেও। কৃশানু কিছুক্ষণ ভেবে বলল,

- ঠিক আছে। পেছনদিক দিয়ে যাও। খুব ধীরে যাবে। আমরা চারদিক থেকে তোমাকে কভার দেব।

- ঠিক আছে, স্যার।

কানাইয়ের জ্যাকেটটা খুলে দিল কৃশানু। সে খুব ধীর পায়ে এগিয়ে গেল মন্দিরের পেছনে। মন্দিরের ভেতরে কী আছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সন্ধে হয়ে গেছে, মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সার্চলাইট জ্বালাতেই হবে। কৃশানু কানাইয়ের পেছনে এগোল। বাকিরা গোলাকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

কানাই এগোচ্ছে খুব ধীর পায়ে। তবুও পাতার শব্দ এই নিশুতি জঙ্গলকে আলোড়িত করছে। এই সাহসটা যে কানাই দেখাচ্ছে তার জন্য কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। যদি সফল হয় এই মিশন, তবে কানাইয়ের জন্য বিশেষ স্বীকৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।

আর একটা বাঁক ঘুরলেই মন্দিরের মূল দরজা আর সেই দরজার সামনে এলেই বোঝা যাবে যে ভেতরে কে আছে। কানাই লম্বা করে শ্বাস নিল। তারও যে ভয় করছে না এরকম না। কিন্তু সে জানে দেশের জন্য করা যে-কোনো কাজ গর্বের।

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে কানাই মন্দিরের সদর দরজার সামনে গটগট করে চলে এল। আর এসেই কী যেন দেখে তার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। কৃশানু সহ সবাই কানাইয়ের মুভমেন্টে নজর রাখছিল। কানাইকে এভাবে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে যেতে দেখে সবাই বুঝল ভেতরে কিছু একটা আছে। আর দেরি করা চলে না। কানাই ততক্ষণে মন্দিরের সিঁড়িতে এক পা তুলে ফেলেছে, হয়তো তাকে ইশারায় কেউ ডাকছে ভেতরে।

কৃশানু চিৎকার করে উঠল।

- সার্চলাইট! অ্যান্ড কভার মি!

বিদ্যুৎবেগে কৃশানু এগিয়ে গেল মন্দিরের সদর দরজার দিকে। তার পেছনে কভার দিল বাকি তিনজন। সার্চলাইটের আলোতে ঝলসে উঠল অন্ধকার মন্দিরচত্বর।

আর তখুনি চিৎকার করে উঠল কানাই।

- গুলি করবেন না স্যার, গুলি করবেন না!

কৃশানু সহ বাকিরা বন্দুকে চাপ দিতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে থমকে গেল এই চিৎকারে।

সবাই মন্দিরের সামনে আলো নিয়ে এগিয়ে গেল।

মন্দিরের ভেতরে একটা কিশোর বসে আছে। ঋষি আস্তিকের একটা মূর্তির সামনে বসে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

কৃশানু প্রশ্ন করল,

- ছেলেটাকে চেনো তুমি, কানাই?

কানাই মাথা নাড়ল।

- আমাদের গ্রামের ছেলে। শহরে সাপের খেলা দেখাতে যায় এর বাপ।

- এই, এদিকে আয়।

ছেলেটা এত চ্যাঁচামেচিতে ভয় পেয়ে গেছে। তার ওপর সবার হাতে বন্দুক দেখে সে এখন ঘামছে। সে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এল।

- কী করছিস এখানে?

কৃশানু প্রশ্ন করে দেখল কিশোরের প্যান্ট ভেজা। সে জল এগিয়ে দিল। কিশোর জল খেয়ে কোনোমতে বলল,

- রোজ আসি, স্যার। প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে যাই। আমরা সাপুড়ে। এই গ্রামে আস্তিক মুনির পূজা আমরাই করি, স্যার।

- এখানে আর কাউকে দেখেছিস এর মধ্যে?

কিশোর মাথা নেড়ে না করল। আর তখনি ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটা শব্দ হল। সমস্ত সার্চলাইট সহ প্রত্যেকটা বন্দুকে নিমেষে ঘুরে গেল সেদিকে। কেউ আসছে। সবাই ট্রিগারে চাপ দিয়ে রাখল।

ঝোপঝাড় থেকে বেরোনোর আগে একজনের কণ্ঠ শোনা গেল,

- কেউ ফায়ার কোরো না। আমি হৃষীকেশ।

হৃষীকেশ বেরিয়ে এল ঝোপের মধ্যে থেকে। সবাই বন্দুক নামিয়ে নিল।

- স্যার, শহর থেকে ফোন এসেছে। বাচ্চাটাকে ফিরিয়ে দিয়েছে আততায়ীরা।

- হোয়াট?

- হ্যাঁ। তবে এই গ্রামে যে আততায়ী লুকিয়ে ছিল সেটাও কিন্তু ভুল খবর নয়। আমি ওদের পালাতে দেখেছি। যতক্ষণে পৌঁছেছি ততক্ষণে কাঁটাতারের ওদিকে লাফ দিয়ে দিয়েছে। একটা গুলি চালিয়েছিলাম, কিন্তু লাভ হয়নি।

- আচ্ছা, তাহলে গুলির শব্দটা ঠিকই শুনেছিলাম আমরা।

- হ্যাঁ, এরপরই আমি আপনাদের ফেলে রাখা চিহ্ন ফলো করে এখানে এসেছি।

কৃশানু কানাইয়ের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল,

- কাঁটাতারের ওদিকে কি অন্য দেশ? না, ভারত?

- ভারতই, স্যার। এদিকে বিভিন্ন সময়ে কাঁটাতার দেওয়া হয়েছে। তবে বর্ডারের কাঁটাতার এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে।

কৃশানু আর দেরি করল না। সদলবলে জঙ্গল থেকে রওনা দিল গ্রামের পথে।

- তার মানে ওরা ভারতেই আছে এখনওও। বর্ডার সিল করতে হবে। এক্ষুনি চেজ করে ধরতে হবে ওদের।

কানাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে কৃশানু সহ সবাই ফিরে এল। কানাইয়ের সাহসিকতার জন্য তার জন্য পুরষ্কারের ব্যবস্থা করবে কথা দিল কৃশানু। কানাই তাদের হাত নেড়ে বিদায় দিয়ে ফেরার পথ ধরল।

কিন্তু কানাই গ্রামে নিজের ঘরে ফিরল না। ঢুকে গেল জঙ্গলে। সঙ্গে নিল টর্চের আলো। জঙ্গলের সেই জায়গাটায় পৌঁছল যেখানে রাস্তা দু'ভাগ হয়েছে। আগের বার সবাইকে নিয়ে সে ডানদিকের রাস্তাটায় ঢুকেছিল। এবার সে রওনা দিল বামদিকের রাস্তায়। বারবার পেছনে তাকাতে লাগল আর সন্তর্পণে যথাসম্ভব দ্রুত হাঁটতে লাগল। অনেকটা পথ হাটার পর একটা মন্দির দেখা গেল। সে মন্দিরের সদর দরজার কাছে পৌঁছে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। আশেপাশে কেউ নেই বুঝে সে ঢুকে পড়ল মন্দিরের ভেতর। দরজা লাগিয়ে দিল।

মন্দিরের ভেতর লণ্ঠন জ্বলছে। দু'জন লোক বসে আছে সেখানে। এটা উতঙ্ক ঋষির মন্দির, যে ঋষি রাজা জনমেজয়কে সাপেদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিলেন।

- আজ সময় থাকতে জানতে পেরেছিলাম বলে বুদ্ধি করে বাঁচিয়ে দিলাম তোদের। তোরাও আমার কথামতো সব করেছিস বটে। তবে বারবার তোদের আস্তিক মুনির মতো বাঁচাতে পারব না।

মেঝেতে বসে বলল কানাই।

- আস্তিক মুনি কে?

একটা লোক জিজ্ঞেস করল।

- সে অনেক গল্প। শোন, এখানে তোদের থাকাটা আর নিরাপদ নয়। চলে যা অন্য শহরে। আরও তো বোম ব্লাস্ট করতে হবে নাকি!

- জি।

কানাই তাদের বেশ কিছু কাগজপত্র বুঝিয়ে দিল। তারপর বলল, আমাদের যুদ্ধে আমরা একদিন ঠিক সফল হব।

সবাই একত্রে বলল,

- ইনশাল্লাহ!

ব্যাগ গুছিয়ে সবাইকে নিয়ে বাইরে এল কানাই। আর ঠিক তখনই চারদিকে একত্রে জ্বলে উঠল অজস্র ফ্লাডলাইট। কানাই সহ দুই আততায়ী এত আলো একসঙ্গে দেখে চোখ ঢেকে নিল আর ওই অবস্থাতেই তাদের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিল ভারতীয় টাস্ক ফোর্স।

তিনটে রক্তাক্ত মৃতদেহের সামনে এসে কৃশানু বলল,

- আস্তিক মুনি বারবার সাপেদের বাঁচাতে পারবে না কানাই, ওরফে মোহম্মদ। ইয়াসির কোথায় গেলি, ব্যাগ আর কাগজপত্রগুলো চেক কর।

ইয়াসির একবার জিজ্ঞেস করল,

- কখন সন্দেহ হয়েছিল, স্যার? কীভাবে বুঝলেন?

কৃশানু মুচকি হেসে শুধু বলল,

- এত বছর ধরে তবে কী করলাম টাস্ক ফোর্সে থেকে যদি এরকম আস্তিকদের চিনতে না পারি! সেসবই আমার ইন্দ্রিয়সক্ষম ক্ষমতা। চোখকান খোলা রাখলেই একজন আততায়ী আর সাধারণ মানুষ চিনতে পারি। ইয়াসির, আর দেরি করিস না, সার্চ কর। বাকিরা মৃতদেহ শহরে পাঠাবার ব্যবস্থা করো।

কথা শেষ করে কৃশানু এগিয়ে গেল মোহম্মদের দিকে। লোকটা মরে গেছে, কিন্তু তার চোখে এক অবিশ্বাসের ছায়া। সে মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও যেন বিশ্বাস করতে পারেনি যে তার এত ভালো অভিনয়টা কাজে এল না।

কৃশানু এগিয়ে মৃতদেহের ময়লা জামাটা টেনে ঘাড়টা আর একবার ভালোভাবে দেখে নিল। উর্দু ভাষায় লেখা উল্কিটা আছে সেখানে। পজিশন নেওয়ার সময় এক হ্যাঁচকা টানে নিজের কাছে এনেছিল কৃশানু। তখনই জামা সরে গিয়ে প্রথম চোখে পড়ে উল্কিটা।

কৃশানু উঠে দাঁড়ায়। সিগারেট ধরায়। ধোঁয়ার রিং বানায়।

লাস্যময়ী

"প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমরা হঠাৎ করেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছি।"

বন্ধ ঘরে নিজের হুইস্কির গ্লাস নিয়ে পদচারণা করছেন ফ্রান্সের এক মধ্যবয়স্ক আধিকারিক। তাঁর কপালে চিন্তার ভাঁজ।

- এই মুহূর্তে যদি দেশের জনগণের দৃষ্টি কিছুদিনের জন্য অন্যদিকে ডাইভার্ট করা না যায়, তাহলে রক্ষে নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।

অন্য একজন পদস্থ আধিকারিক, যিনি বয়স এবং পদমর্যাদা দুয়েতেই প্রথম আধিকারিকের চেয়ে সিনিয়র, তিনি এতক্ষণ চুপচাপ নিজের গ্লাসের পানীয় শেষ করছিলেন। শেষ চুমুক দিয়ে বললেন,

- লেট ইন্ট্রোডিউস মাতাহারি টু দ্য নেশান, দ্য স্পাই!

প্রথম আধিকারিক মুখ থেকে গ্লাস নামিয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলেন বক্তার দিকে। মুখ থেকে শুধু বেরিয়ে এল,

- হোয়াট? আবার! নো নো...

- ওই ছয়জনের কী হল? খোঁজ নাও।

চুরুট ধরালেন বরিষ্ঠ আধিকারিক।

***

রাত এখন প্রায় এগারোটা। হোটেল এলিসি প্যালেসের লাউঞ্জ পার্টি জমে উঠেছে। ধীরে ধীরে উদ্দাম হয়ে উঠছে নরনারীর শরীরী ভাষা। এখন দেখলে বোঝার উপায় নেই যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে প্রায় তিন বছর শেষ হতে চলল। দেশের সাধারণ লোকজনের খাবার নেই, পরার মতো পোশাক নেই, বাসস্থান আর কতদিন থাকবে জানা নেই। অক্ষশক্তি যে হঠাৎ করে এতটা এগিয়ে যাবে রণকৌশলে, তা বোঝা যায়নি আগে। জার্মানি লিড করছে যুদ্ধে। আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিদিন খুন, ধর্ষণ চলছে। চলছে বোমাবাজি। দফায় দফায় বৈঠক করেও ইন্টালিজেন্স ব্যুরো বুঝতে পারছে না কী করা যায়। সবাই ধরেই নিয়েছিল অক্ষশক্তির পরাজয় নিশ্চিত। সেই জায়গায় জার্মানির নেতৃত্বে এই উত্থান সত্যিই ভয় ধরাচ্ছে। আর কে'ই বা না জানে, সর্ষের মধ্যেই ভূত না থাকলে এভাবে ঘুরে দাঁড়ানো যায় না। তাই এবার ভূত খুঁজে শেষ করার পালা।

তবে এসব নিয়ে পাঁচতারার লাউঞ্জ পার্টির কেউ বিন্দুমাত্র ভাবছে বলেও মনে হচ্ছে না। বলরুমের শান্ত সমাহিত ভাব কেটে এবার একে একে ভদ্রমহিলাদের হাতবদলের নাচ শুরু হয়ে গেছে। আবার উলটোটাও একইভাবে ঠিক। নেশার ঘোরে একে অপরকে ছুঁয়ে যাওয়া। এই জায়গায় গরিবের চিৎকার পৌঁছনোর কথা ছিল না কোনোদিনই, পৌঁছয়ওনি।

কিছু সময় এভাবেই কাটল। দামি বোতল খালি এবং গ্লাস ভরতি হওয়ার খেলা যখন শেষ রাউন্ডে গেল, চলে এল মুখোশ। সুরভিত নরনারীরা একে একে পরে ফেলল সে মুখোশ। লাউঞ্জের আলোগুলো কমে এল; লাল, নীল ও সবুজের তীক্ষ্ণ ছটা খেলা করতে লাগল চারদিকে। এতক্ষণ শুধু হাতবদল হচ্ছিল নাচের তাগিদে। আগামী দশ মিনিটে মুখোশ পরে কে যে কোথায় কার হাত ধরে একে একে হারিয়ে যেতে থাকল তার কোনো ইয়ত্তা রেকর্ড বুকে থাকবে না। লিফট ধরে কিম্বা সিঁড়ি করে নিজেদের রুমের দিকে চলে থাকল সবাই। এরই মধ্যে এই পার্টির অন্যতম সুন্দরী, স্বল্পবসনা, পীনোন্নত পয়োধরা মধ্যবয়স্কা তার নাচের তালে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ল কালো স্যুট পরা অভিজাত পুরুষটির বুকে। দু'জনে দু'জনের কানে ফিশফিশিয়ে কিছু বলল। লাস্যে ফেটে পড়ল সুন্দরী। পুরুষের গালে আলতো নখরাঘাত করে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। পেছন ফিরে একবার চেয়ে দেখল, পুরুষটি তার পানেই ছুটে আসছে।

দু'জনেই লিফটে চড়ল, খালি লিফট। একজন অপরজনে বুঁদ হয়ে থাকল যতক্ষণ পর্যন্ত না লিফটের দরজা খুলছে। দরজা খুলতেই সামনে উপস্থিত দু'জন লোক দেখল মহিলা নিজের ঠোঁট মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসছে, পেছন পেছন নিজের স্যুট ঠিক করছে এক পুরুষ। রুম নম্বর ৭০১-এ ঢুকে গেল তারা। একটি নোটিশ বাইরে ঝুলতে থাকল— ডু নট ডিসটার্ব।

লিফটের সামনে যে দু'জন ছিল তারা একে অপরের দিকে চাইল এবং ইশারায় কিছু একটা বলল। একজন লিফট দিয়ে নিচে নেমে গেল। অন্যজন নিজের পজিশন নিয়ে নিল।

এদিকে রুমের ভেতরে যেন ঝড় উঠেছে। প্রাপ্তবয়স্ক দুই নরনারী একে অপরের গায়ে আদরের আঘাত হানছে। পুরুষ নারীটিকে কোলে তুলে নিয়েছে এবং সে নিজেই তার পোশাক ঢিলে করে দিচ্ছে। ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে চলছে গভীর সম্ভাষণ। একসময় খেলাটা বিছানার পর্যায়

নেমে এল। সাদা শুভ্র মোলায়েম বিছানার মখমল চাদরে রক্তমাংসের শরীরী খেলা শুরু হল।

বাইরে একজন দাঁড়িয়েছিলেন। অন্যজন আরও দুই সশস্ত্র ব্যক্তিকে নিয়ে এসে পজিশন নিলেন। ডু নট ডিস্টার্ব বোর্ড ভেদ করেও রুম থেকে এক নারীর মর্ষকামের শীৎকার শোনা যাচ্ছে। সশস্ত্র ব্যক্তিদের একজন রুমাল দিয়ে কপালটা মুছলেন। সিনিয়রের ইশারার অপেক্ষায় আছেন তিনি।

আর অল্প কিছু সময় কাটল, একটা বড়ো চিৎকারের পর সব শান্ত হল। চারজনের মধ্যে যিনি সিনিয়র, তিনি ইশারায় কিছু বললেন এবার। সবাই এগিয়ে গেল রুমের দিকে। একজন বোর্ডটা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন, অন্যজনের বন্দুক গর্জে উঠল লক বরাবর।

চারজনে একসঙ্গে ঢুকতে দেখে হকচকিয়ে গেল ভেতরে উপস্থিত দু'জন। যেসময় সবচেয়ে বেশি বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, রক্তসঞ্চালন আবার স্বাভাবিক হতে থাকে, সেই মুহূর্তে এত লোকের আগমনে অপ্রস্তুত হওয়াই স্বাভাবিক। চারজনের মধ্যে একজন বললেন,

- লেটস হ্যাভ আ কাপ অফ কফি, মাতাহারি।

পুরুষ এখনও স্বাভাবিক হয়নি, বারবার মুখ দিয়ে "হোয়াটস হ্যাপেনিং, হু আর দে" বেরিয়ে পড়ছে। কিন্তু নারী একদম স্বাভাবিক। সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় একটা চাদরকে বুক অব্দি জড়িয়ে রেখেছে সে। ওই অবস্থাতেই বিছানার পাশে একটা ছোটো টেবিলে রাখা সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরিয়ে সে বলল,

- বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আমি তৈরি হয়ে আসছি।

কথা বলার ধরনে এতটাই সততা ছিল যে দাগী আসামিকে ঘরে রেখেই বেরিয়ে গেলেন চার অফিসার। কিছুক্ষণের মধ্যে মাতাহারি তৈরি হয়ে চলে এল, চারজন তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ভাঙা দরজার ঘরে হোটেল কর্মীরা এসে দেখল বিহ্বল অবস্থায় পড়ে আছে এক পুরুষ, পরনে একটি চাদর মাত্র।

একটি বন্ধ ঘরে আলোচনা চলছে। না, আলোচনা ভুল বলা হল, জেরা চলছে। টেবিলের একধারে মাতাহারি ওরফে মার্গারিটা গিরট্রুইডা ম্যাকলয়েড, অপরপ্রান্তে ফরাসি ইন্টালিজেন্স।

- আমি কি জানতে পারি আমাকে দ্বিতীয়বারের জন্য কেন গ্রেপ্তার করা হল?

- কারণ, তুমি প্রথমবার মিথ্যে কথা বলেছিলে।

- আমি কোনো মিথ্যে বলিনি।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে উত্তর দেয় মাতাহারি।

- বেশ। তাহলে কেন তোমার বয়ান অনুসারে প্রাপ্ত ছয় জার্মান গুপ্তচরের ওপরে হামলা হচ্ছে? একজনের ইতোমধ্যে খুন হয়ে গেছে, অন্যজনকে এইমাত্র তোমার বিছানায় দেখে এলাম আমরা। আমরা না এলে হয়তো আজকেই সে...

- ফ্রান্স কি এখন জার্মান গুপ্তচরদের প্রোটেকশানের দায়িত্ব নিয়েছে?

- কথা ঘোরাবার চেষ্টা করবে না তুমি! এই ছয়জন জিরো লেভেল গুপ্তচর। তবু কার ইশারায় তুমি এদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিচ্ছ তা আমাদের জানতে হবে।

- আমি সেই দায়িত্বে নেই। আপনারা ভুল করছেন, অফিসার। আমার সঙ্গে গুপ্তচরটির এক বিছানায় থাকাটা কাকতালীয় কারণ, পার্টি লাউঞ্জে মুখোশ পরে ছিল সবাই।

অফিসার আর নিজের উষ্মা চেপে রাখতে পারলেন না। এগিয়ে গেলেন মাতাহারির দিকে।

- তোমার বা তোমার মতোদের জন্য আমার দেশের পঞ্চাশ হাজারের বেশি সৈন্য শহিদ হয়েছে। ইউ আর ইন ডিপ স্যুপ! এখন সত্যিটা বলা ছাড়া তোমার উপায় নেই।

- আমার সত্যি খুব অনেকদিন আগেই মিথ্যে প্ররোচনায় দেশ কেড়ে নিয়েছে। দেশের প্রধান, সৈন্যদলের প্রধান শুধুমাত্র ব্যবহার করে ছুড়ে ফেলেছে আমাকে। আমার জীবন থেকে ভালোবাসা চলে গেছে...

কথা শেষ করতে পারে না মাতাহারি। অফিসার তার মুখের কথা ছিনিয়ে বলেন,

- তাতে কী? ভালোবাসা গেলেও বিছানা তো আছে!

হাসির রোল ওঠে ইন্টারোগেশান রুমে। মুখচাপা হাসি নয়, রীতিমতো হাসির ফোয়ারা।

তা দেখে মাতাহারির চোখে যেন রক্ত নামে। একটানে সিগারেট শেষ করে অন্যটা ধরায় সে।

- শোনো হে মাতাহারি, চল্লিশোর্ধ্ব মহিলা যদি কুড়ি বাইশের প্রেমিক জোটায় তবে সবাই ব্যবহার করেই ছেড়ে দেবে। আর কীরকম মহিলা! নাহ্, যে অতি আধুনিকা! বিশ্বের অন্যতম প্রথম ন্যুড

ফটোগ্রাফি নিয়ে যার কালচার। বাকি সময় কোথায় কাটে, বারে বা ক্যাবারেতে নেচেকুঁদে। তার জীবনে ভালোবাসা! ছো!

অফিসার চেয়ারে ফিরে গেলেন। রুমে কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

- এই যা যা বললেন, সব একজন পুরুষ করলে অসুবিধে নেই, শুধু নারী করলেই সে ভালোবাসার অধিকার হারায়। বিশ্বযুদ্ধের নামে দেশের লোক মেরে, যুদ্ধক্ষেত্রে রাতের বিনোদনের জন্যে দশজন পুরুষের অনুপাতে একজন মেয়ে ভাড়া করে এনেও পুরুষজাতির পতাকা উড়বে, আর একই কাজ করে নারীর পতাকা পুরুষের কোমরবন্ধনী হবে, এটা সাহেব আমি মেনে নিতে পারি না।

- আর পার না বলেই কি দেশদ্রোহী হয়েছ? কীভাবে খুন করলে সেটা বলো। কী কী খবর পাচার করলে সেটা বলো।

- বেশ বুঝতে পারছি পরাজয়ের ঘনঘোর ঘটা সামাল দেবার জন্যেই ফরাসি শিবির মাতাহারির আঁচল খুঁজছে।

একরাশ ঘৃণা ছুড়ে দিয়ে মাতাহারি আবার বলল,

- বেশ তবে, শুনুন। সত্যি-মিথ্যে নিয়ে ভাববেন না। যেটা শুনতে চাইছেন সেটা শোনাচ্ছি। তবে দিনশেষে যদি ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট না দেন তবে কিন্তু ভুল করবেন। শত হোক দেশদ্রোহী নারী দেশদ্রোহী পুরুষ অপেক্ষা বেশি ভয়ংকর।

- চেষ্টা করব। শুরু করো।

- স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকে আমি আরও স্বাধীন হয়ে পড়ি। নিজের মতো করে জীবন কাটাতে থাকি। কাজের কারণে ফ্রান্স এবং জার্মানের বড়ো বড়ো মাথার সঙ্গে পরিচয় ঘটতে থাকে আমার। তারাও আমার সৌন্দর্যে বিভোর হতে থাকে, আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে। এরই মাঝে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। আমি যেহেতু মূলত ডাচ, আর নেদারল্যান্ডস প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিষ্ক্রিয়, তাই নিউট্রাল দেশের বাসিন্দা হয়ে সবদিক দিয়েই সমস্যায় পড়ে যাই। যে-কোনো দেশে অবাধ আসা-যাওয়া বন্ধ হয়, ব্যাবসায় ক্ষতি হতে থাকে। সেই সময় আমি এক ফরাসি যুবকের প্রেমে পড়ি এবং এতটাই পড়ি যে আর কখনও কাউকে ভালোবাসিনি; সে'ও আমাকে এভাবেই ভালোবাসত।

এইটুকু বলে থামে মার্গারিটা ওরফে মাতাহারি।

- থামলে চলবে না। আমাদের সময়ের দাম অনেক!

- আর আমার যে সময়টা শেষ হতে চলেছে?

- আরোহীকে নিজের মালের দায়িত্ব নিজেরই নিতে হয়। বাকিটা বলো। স্বীকারোক্তি দাও, সাসপেন্স শেষ করো যে তুমিই আততায়ী।

- এটা সাসপেন্সের গল্প নয়। রহস্য নেই এই গল্পে। প্রথম থেকেই ফরাসি সরকার বাহাদুর আমাকে কাঠগড়ায় তুলে রেখেছে। মিডিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে বেশি খবরে রেখেছে ক্যাবারে ডান্সার, ন্যুডের জননী মাতাহারিকে। রহস্য কোথায়? শুধু গল্পটা সবাইকে জানাচ্ছি নিজের মুখে, এইটুকুই থ্রিল।

অফিসার মুখে চুক চুক আওয়াজ করে ঘড়ি দেখলেন। মাতাহারি গল্পে ফিরল।

- আমি আমার ব্যাবসা বন্ধ করে আমার ভালোবাসার কাছে যেতে ফ্রান্সে পৌঁছলাম। ডকেই আমাকে বাধা দেওয়া হল। সেখান থেকে সোজা আমাকে পেশ করা হল ফরাসি সদর দপ্তরে। স্বয়ং আর্মি-প্রধান দেখা করলেন আমার সঙ্গে। আমি তাঁকে আমার আসার উদ্দেশ্য জানালাম। তিনিও মুখে আপনার মতো চুক চুক শব্দ করে বললেন, হাউ স্যাড! কিন্তু তোমাকে তো দেখা করতে দেওয়া যাবে না। তুমি নিউট্রাল দেশের প্রতিনিধি। দেশে ফিরে যাও। ওখানে ভালোবাসা খোঁজো।

আমি তাকে আমার সমস্ত কাগজপত্র দেখালাম। আমার বেশিরভাগ জীবনই ফ্রান্সে কেটেছে। সেসব নজির দেখালাম। তবু তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। শুধু বললেন, আমাকে কী দিতে পারবে যদি আমি তোমার প্রেমিকের কাছে তোমাকে যেতে দিতে রাজি হই?

আমি বললাম, আপনি বলুন আপনার কী চাই।

উনি আমাকে সরাসরি প্রস্তাব দিলেন, ফ্রান্সের হয়ে গুপ্তচরের কাজ করো এবং আমার প্যান্টের হুকট খুলে কাজে লেগে পড়ো।

আবার থামল মাতাহারি। অফিসাররাও নিজেদের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকলেন। একটু সময় কাটার পর একজন বললেন,

- তারপর?

- তারপর আমি ওঁর দুটো শর্তেই রাজি হলাম, অবশ্য রাজি হলাম বলার চাইতে বাধ্য হলাম বলাটা বেশি যুক্তিগ্রাহ্য। আর কোনো উপায় ছিল না আমার। আমার লেভেলও জিরো, গুপ্তচরের ভাষাতে। তবু আমি অনেক রেড লেভেল গুপ্তচরের থেকেও বেশি ইনফরমেশন দিয়ে গেছি ফ্রান্সকে।

- এক মিনিট, এক মিনিট! তোমার ওপর অভিযোগ তুমি জার্মানির হয়ে কাজ করেছ, আর তোমার গল্পে তুমি বলছ তুমি ফ্রান্সের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করেছ? হিসেব মিলছে না যে।

- প্রথমত বৃত্তি নয়, শুধু গুপ্তচর। এর বদলে আমি কিছু পাইনি দেশদ্রোহীর তকমা ছাড়া। প্রেমিকের সঙ্গে থাকার সুযোগ হয়েছিল মাত্র দু'দিন। তারপর আবার বেরিয়ে যেতে হয়েছিল খবরের সন্ধানে। আর আপনারা তো ভালোই জানেন, এই দুনিয়ায় ঢোকার রাস্তাটাই কেবল আছে। বেরোবার রাস্তাটা আপনারা বন্ধ করে দেন, যেভাবে আজ আমার বন্ধ দিয়েছেন।

আমিও এই দুনিয়ায় প্রবেশ করে ফেলেছিলাম, ভেবেছিলাম একবার কাজ হাসিল হয়ে গেলে আমায় ছেড়ে দেওয়া হবে শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাবার জন্য। ভুল ছিলাম। একে একে জার্মান ইন্টেলিজেন্সের সমস্ত খবর আমি দিতে থাকলাম ফ্রান্সকে। একের পর এক জার্মান ক্ষমতাসীন ব্যক্তির শয্যাসঙ্গিনী হলাম নির্দ্বিধায়। এক সময় বোকা আমি ভেবেই বসেছিলাম দেশের জন্য কাজ করছি। অথচ যখন যখন নিজে এসে খবর দিতাম তখন বন্ধ ঘরে ফ্রান্সের তাবড় তাবড় প্রধান ব্যক্তিরা সাবাশির বদলে শুধু নিজের প্যান্টের হুকটা দেখিয়ে দিত।

ততদিনে জার্মানরাও কিছুটা আঁচ করে ফেলেছে আমার অভিসন্ধি। এদিকে দেশের কাজে ভালোবাসা হারিয়ে একেবারেই একা হয়ে গেলাম। বেঁচে থাকার উৎসাহটাই হারিয়ে ফেললাম। ফ্রান্সেরও ততদিনে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে। এরকমই একদিন...

- একদিন? কী হয়েছিল?

- আমারই এক জার্মান ক্লায়েন্ট আমাকে একটা ব্রিফকেস দেন। সেদিন সকালেই আমার ফ্রান্সে ফেরার কথা ছিল। তিনি দিয়ে বলেন এটা তার পরিবারের হাতে পৌঁছে দিতে। আমি বিশ্বাস করি সেকথায়। কারণ কোনো ব্যক্তি তার পরিবারকে কী দিচ্ছে সেটা আমি খুলে দেখাটা রুচিবোধের বাইরে মনে করেছি। আমি সেই ব্রিফকেস নিয়ে সোজা চলে আসি ওই ব্যক্তির পরিবারের কাছে। প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় তাঁর বাড়িতে তখন রিপোর্টার ছিল। আমার সেই ব্রিফকেস ওঁর গিন্নির হাতে পৌঁছে দেবার খবর ফলাও করে পরের দিন ছাপা হল। ব্যস, আর যাই কোথায়! দু'দিন পর যখন জার্মানিতে ফিরছি, তখন আপনি এলেন এবং আমাকে জাহাজ থেকে গ্রেপ্তার করলেন।

মাতাহারি সামনে রাখা জলের বোতল থেকে ঢকঢক করে জল পান করল।

- এত সহজ? এত সোজা?

- এটাই সত্যি অফিসার। বিশ্বাস করুন।

- এর পক্ষে কোনো প্রমাণ আছে তোমার কাছে?

- না, নেই। ওই ব্যক্তি এবং তাঁর পরিবার আমি গ্রেপ্তার হবার তিনদিনের মাথায় বোমার আঘাতে মারা যায় জার্মানিতে। সেই ব্রিফকেসে কী ছিল আমি নিজেও দেখিনি। মিথ্যে বলতে পারব না। আমার হয়তো দেখা উচিত ছিল। অন্তত এভাবে বেঘোরে প্রাণটা যেত না। আর এই ঘটনার পর এক এক করে জার্মানদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সামনে আসতে থাকে। আমি একেবারে দেশভক্ত সাধারণ ক্যাবারে ডান্সার থেকে হঠাৎ করেই জার্মানের গুপ্তচরে পরিণত হয়ে যাই।

- আর তোমার বলা ছয়জনের মধ্যে একজনের খুন? সেটা কেন করলে?

- আমি প্রথমবারের জেরায় এদের নাম নিয়েছিলাম কারণ সেটা আমি জার্মানিতে থেকে গুপ্তচরের কাজ করার সময় জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনতামও না। আর খুন আমি করিনি। ফাঁসির মঞ্চেও তাই বলব। হয়তো আমাকে ফাঁসাবার জন্যেই...

একে একে বাকি অফিসারেরা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। শুধু সিনিয়র অফিসার থেকে গেলেন। মাতাহারির কাছে এসে বললেন,

- জীবনে অনেক কেস দেখেছি, এমনকি সরাসরি তোমাকে বলছি, ফরাসি সরকার এই মুহূর্তে তোমাকে সামনে রেখেই দাও খেলতে চাইছে। এমনকি তোমার কাহিনিও সত্যি ধরে নিচ্ছি। কিন্তু এই কেসটা ঠিক লাগছে না আমার। কিছু একটা গরমিল আছে। হয়তো ইতিহাসে সেটা ধামাচাপা পড়ে যাবে।

- ইতিহাস কিছু জিনিসকে ভুলিয়ে দেয় কোনো নির্দিষ্ট কারণ থাকে বলেই। আমাকে নিয়ে ভাববেন না। শুধু মেক ইট শিয়োর, যেন আমার ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হয়। প্লিজ!

অফিসার দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই একটি সাজানো ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মিডিয়াকে সাক্ষী রেখে। তারপর একদিন অফিসার আবার দরজা

খুলে ভেতরে এলেন,

- মাতাহারি, আপনি তৈরি?
- হঠাৎ আজকে আপনি সম্বোধন করছেন?
- কারণ আজীবনের জন্য একটা খটকা নিয়েই বেঁচে থাকব?
- আমি তৈরি।
- একটা শেষ প্রশ্ন?
- এখনও জেরা?
- ছি ছি, জেরা নয়।
- বলুন।
- মানে, আমার সন্দেহ, আপনি সত্যিই কি মাতাহারি?
- চলুন, আমাদের সময় হয়ে গেছে বোধহয়।

অফিসার আর কিছু বললেন না। সিপাহিদের আদেশ দিতেই তারা মাতাহারিকে নিয়ে চলল। অচিরেই তারা উপস্থিত হল ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। সেখানে বারোজন ফরাসি সৈনিক তৈরি ছিল। ধীরে ধীরে মাতাহারিকে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত করল সিপাহিরা। অফিসার হাত বাড়িয়ে বিখ্যাত নাচিয়েকে আহ্বান করলেন। মাতাহারিও সেই হাত ধরে এগিয়ে গেলেন মঞ্চের দিকে। তখন সবে ভোর, সূর্য উঠি উঠি করছে। পাখিদের শুধু শব্দ শোনা যায় কয়েদখানার বাইরে থেকে। মাতাহারি অফিসারের হাত ছাড়িয়ে একা মৃত্যুমঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন। দু'হাত খুলে একবার প্রাণভরে বেঁচে নিলেন জীবনের শেষ কিছু মুহূর্ত।

তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন। বারোজন সশস্ত্র সৈনিকের উদ্দেশ্য উড়ন্ত চুমু পাঠিয়ে আহ্বান করলেন। অফিসার চোখ বন্ধ করলেন একবার, তাঁর চোখেও জল ছিল। তিনি জানতেন এই নর্তকী দেশদ্রোহী নয়। চোখ খুলে রুমাল মাটিতে ফেলে কর্তব্য সারলেন। বারোজন সৈনিকের বারোটি বন্দুক একসঙ্গে শেষ গান স্যালুট দিল মাতাহারিকে।

***

তিরিশ বছর কেটে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও শেষের পথে। ভারতবর্ষের এক প্রত্যন্ত গ্রামে এক স্বেচ্ছাসেবিকা নিজের ঘরে একটি ছবি মুছছেন। তার বয়স সত্তর। তার খাস পরিচারিকা এলেন। কিছু ফল আর বাটি নিয়ে।

- ফল এনেছি। আর এই গ্রামে দেখেছি জন্মদিনে এরকম একটা মিষ্টি পদার্থ খেতে হয়।

বৃদ্ধা বললেন,

- ওটাকে মিষ্টান্ন বলে এই এলাকায়। আশা করি মর্নিকার ভালো লাগবে।

বলে ফল আর মিষ্টান্ন এগিয়ে দিলেন ছবির দিকে। পরিচারিকা তাকে ডাকলেন,

- মাতাহারি...

হাত তুলে থামালেন বৃদ্ধা।

- ওই নাম মর্নিকা অনেক আগে আমার থেকে নিয়ে নিয়েছে। বড়োবোনের দায়িত্ব পালন করেছে। এখন আমি শুধু সিস্টার পেরিল। চলো চলো, গ্রামের মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে যে কর্মসূচি ভেবেছিলাম সেটা নিয়ে একবার আলোচনায় বসি।

সুইসাইড
টাওয়ার
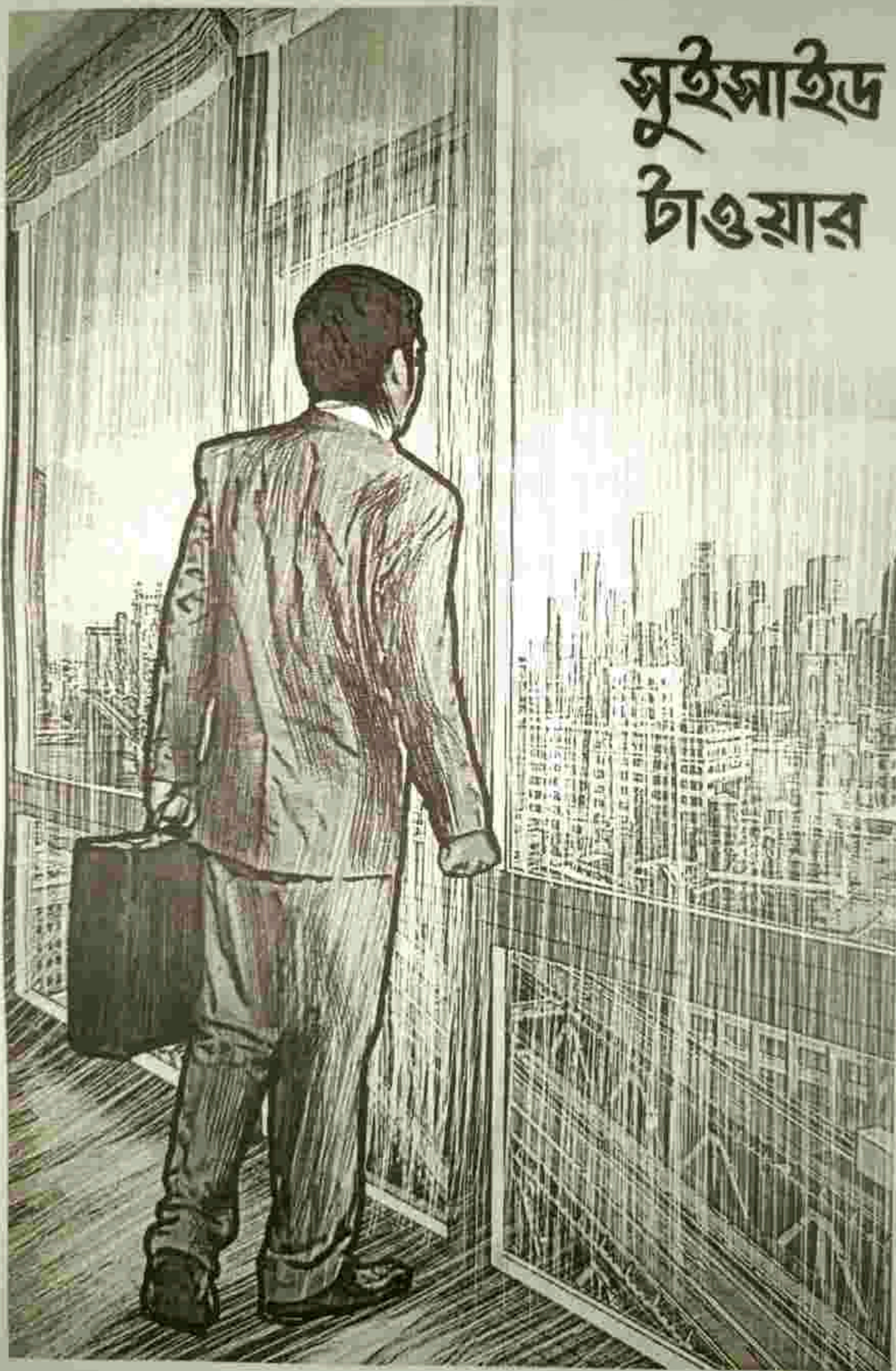
টিক টিক টিক... টিক টিক টিক...

কালো ট্রাউজার্স, কালো ব্লেজার, কালো চশমায় আপাদমস্তক মোড়া সুমন্ত দাঁড়িয়ে আছে এক ঝাঁ-চকচকে বহুতলের শেষ তলায়। লিফটে নম্বর দেখাচ্ছে ৭৮। সামনে কাচের উইংগস থেকে দূরত্ব খুব কমে এসেছে সুমন্তের। চারপাশে অনেক লোক, তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে কিন্তু সুমন্ত কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। গোটা বিল্ডিং জুড়ে শুধু ওই একটা শব্দ—

টিক টিক টিক... টিক টিক টিক...

ব্রিফকেসটা বামহাত থেকে ডানহাতে চালান করে সুমন্ত জিনিসটার দিকে চাইল, বেলা বারোটা বাজতে আর অল্প সময় বাকি।

টিক টিক টিক... টিক টিক টিক...

হাতঘড়ির কাঁটা ঠিক বারোটার ইঙ্গিত করতেই যেন বহুতলে একটা ঝড় উঠল। এ যেন মৃত্যুর ঝড়। আশেপাশের লোকজন ঝাঁপাতে লাগল কাচের উইংগস ভেঙে। হতভম্ব সুমন্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে শুধু দৃশ্যটা দেখে যাচ্ছে। স্যুটেড-বুটেড সমস্ত হাই-প্রোফাইল নরনারী এক এক করে ঝাঁপ দিচ্ছে বহুতল থেকে সোজা নিচে, প্রত্যেকেই যেন জাটিঙার পাখির মতো শেষ উড়ান উড়তে চাইছে।

একসময় কী মনে হল, সুমন্ত হাতের ব্রিফকেসটা ফেলে সোজা দৌড়ে গেল কাচের উইংগসের দিকে। আর তারপর দু'পা জোর করে দু'হাত মেলে সোজা ঝাঁপ, যেন মনুষ্যরূপী কোনো চিল উড়ছে আকাশে। চোখের চশমাটা উড়ে গেল হাওয়ার দাপটে আর তক্ষুনি পাশের লর্ডস টাওয়ারের ঘড়িটায় চোখ গেল সুমন্তর। ১৯শে অক্টোবর, সময় দুপুর বারোটা এক। ঘড়ির পুরোটা সুমন্তর দিক থেকে দেখা যাচ্ছে না, তাই সালটা আর জানা হল না। সুমন্ত একইভাবে নিচে নামতে থাকল। ওপর থেকে কিছু কালো কালো মাথা দেখা যায়, নিচে নামতে নামতে সেই মাথাগুলি এক-একটা মানুষের আকার নিয়ে নিল। মাটি থেকে দূরত্ব আর অল্প কিছু সেকেন্ডের।

পাঁচ... চার... তিন... দুই...

এ-ক-ক-ক!

তীব্র হাড়-ভাঙা চিৎকার করে ঘুম ভাঙল সুমন্তর। ধড়মড়িয়ে উঠে

টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিয়ে কোনোমতে মুখে জলের বোতলটাকে চেপে ধরল সে। আবার ওই এক স্বপ্ন, একই পরিণতি। এই মানসিক চাপ অসহ্য হয়ে উঠেছে সুমন্তর কাছে।

এমনিতেই শেয়ার মার্কেটে কাজ করা লোকেদের রাতদিন শুধু চিন্তায় কাটে, তার ওপর যদি রাতের ঘুমটা এভাবে রোজ রোজ চটকে যায় তবে তো আর জীবন বলে কিছু রইল না! আর এই দুঃস্বপ্নটা শুরু হয়েছে ওই ঘড়িটা কেনার পর থেকে। বিছানার পাশের ড্রয়ার থেকে হাতঘড়িটা বার করে সে।

মাস খানেক আগে সুমন্ত তার কলিগ হিমাংশুর মফস্‌সলের বাড়ি গেছিল। হিমাংশুই নিয়ে যায় তাকে। আসলে বাড়িটা বিক্রি করে দেবে হিমাংশুরা। তাই আসবাব প্যাকিং করা থেকে শুরু করে স্টোররুম পরিষ্কার করা সবকিছুই ছিল। দিন দুয়েক সেখানেই থাকতে হয়েছিল প্যাকার্স ও মুভার্স কোম্পানির লোকেদের সঙ্গে। আর ওই সময়েই স্টোর পরিষ্কার করতে গিয়ে সুমন্ত ঘড়িটা খুঁজে পেয়েছিল।

- আরে, এটা কী জিনিস? এ তো এখনও দিব্বি চলছে রে, হিমাংশু!

হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে হিমাংশু বলেছিল,

- এটা যে বাবা ব্যবহার করত না এটা জানি কারণ, কখনও বাবার হাতে দেখিনি। তবে ঠাকুরদার শুনেছিলাম অ্যান্টিকের শখ ছিল। হয়তো তাঁরই জিনিস এটা।

বলে জিনিসটা ওখানে রেখে অন্য কাজে মন দিয়েছিল হিমাংশু। কিন্তু সুমন্ত অন্যদিকে আর মন দিতে পারেনি। ঘড়িটা তাকে চুম্বকের মতো টানছিল যেন। ঘড়িটা সে অন্যান্য জিনিস থেকে আলাদা করে রেখে দেয়।

ফেরার দিন সকালে হিমাংশুকে ডেকে সে বলেছিল,

- ভাই, তোর যদি আপত্তি না থাকে এই ঘড়িটা আমি রাখতে পারি?

হিমাংশু হেসে বলেছিল,

- আপত্তি! সে আবার কেমন জিনিস! তুই তোর কাছে রাখ। আমার কাছে থাকার থেকে বেশি যত্নে থাকবে। তবে মাঝে মাঝে অফিসে পরে আসতে হবে কিন্তু, এই বলে দিলাম।

সুমন্তও হেসে ফেলেছিল কথাটায়। কিন্তু হিমাংশুকে অবাক করে পরদিন সকালে অফিসেই সুমন্ত পরে এসেছিল এই আদ্যিকালের ঘড়িটা।

হিমাংশু গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল,

- আমি কিন্তু কাল ইয়ার্কি মেরেছিলাম। কর্পোরেট অফিসে তুই এই ঘড়ি পরে আসলি কেন?

সুমন্ত হেসে জানায়,

- ফর্মাল ব্লেজারটা দেখ। মিলিয়ে নিয়েছি। কোনো অসুবিধে হবে না ড্রেস কোডে।

ঘড়িটা বাড়িতে অনেকবার নেড়েচেড়ে দেখেছে সুমন্ত। হালফ্যাশানের রবার কিম্বা স্টেনলেস স্টিলের নয়, সোনালি রঙের ঝিরিঝিরি ডিজাইনের চেইন লক। একদিন কেমন সন্দেহ হতে পাড়ার মোহন স্যাকরাকে দিয়ে দেখিয়ে নিয়েছিল সুমন্ত। মোহন কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করে বলেছিল,

- সুমন্তদা, এ জিনিস পেলে কোথায়?

- কেন, কী হয়েছে?

- আরে, এ তো সোনার জল করা নয়। খাঁটি সোনা দিয়ে বাঁধানো চেইন।

- ওটা ঠাকুরদা ব্যবহার করতেন। ঘর খুঁজতে গিয়ে পেলাম।

বলে মোহনের থেকে ফিরে আসা তো হল, কিন্তু মনের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার জন্ম নিল সুমন্তের। ঘড়িটা যে খাঁটি সোনার, সেটা জানলে কি হিমাংশু অত সহজে তাকে ঘড়িটা দিয়ে দিত? এদিকে ঘড়িটা সুমন্তের বেজায় পছন্দ হয়ে গেছে এ ক'দিনে। এখন যদি গিয়ে হিমাংশুকে সোনার চেইনের কথা জানায় এবং হিমাংশু তা শুনে ঘড়ি ফেরত চায় তবে সে জিনিস মেনে নেওয়াও বেশ কঠিন হবে। সব ভেবে সুমন্ত সিদ্ধান্ত নেয় যে সে ঘড়ির ব্যাপারে হিমাংশুকে কিছু বলবে না। যখন জিনিসটা সে চেয়েছিল তখন তো আর এই ব্যাপারটা জানত না, সাধারণ ঘড়ি ভেবেই চেয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সোনার চেইনের ব্যাপারে জানতে পারলেও তার আর্থিক কোনো লাভ হচ্ছে না কারণ, ঘড়িটা সে বিক্রি করছে না।

সুমন্ত মনকে বোঝানোর জন্য যুক্তি খাড়া করল ঠিকই, কিন্তু অফিসে সে ঘড়িটা পরা বন্ধ করল, পাছে হিমাংশু কোনোভাবে ঘড়িটা ফেরত চেয়ে বসে।

এভাবে দিন কতক কাটল এবং তারপরেই আসল সমস্যা দেখা দিল। রোজ ঘুমিয়ে পড়ার পর একই স্বপ্ন। কোনো এক বহুতলের ৭৮ তলা থেকে সোজা ঝাঁপ। শুরুর দিকে সুমন্ত বুঝে উঠতে পারেনি কেন হঠাৎ এরকম স্বপ্ন সে দেখছে। ভেবেছিল হয়তো স্বাভাবিকভাবে আমরা

সবাই যেভাবে স্বপ্ন দেখি এই স্বপ্নও সেরকম। কিন্তু প্রতিদিন যখন একই স্বপ্ন বারবার ফিরে আসতে থাকে, কেমন যেন একটা মৃত্যুভয় তাকে পেয়ে বসে। স্বপ্নের মধ্যে দেখা প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে সুমন্ত খুব গভীরভাবে চিন্তা করে। যা যা দেখেছে সে স্বপ্নে, যাদের যাদের দেখেছে তার একটা তালিকা তৈরি করে। কিন্তু কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে সে আগে থেকে চেনে না। সবাই অপরিচিত। সুমন্ত নিজে খুব ভালো স্কেচ বানাতে পারে। সে একসময় স্বপ্নে দেখা প্রত্যেকটা বস্তুর স্কেচ বানিয়ে স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা নেয় যে কোথাও কখনও ওসব বস্তু বা জিনিসের সংস্পর্শে সে এসেছে কি না। কিন্তু স্মৃতিশক্তি জবাব দেয় একসময়। সে বুঝতে পারে এসবই তার অপরিচিত। একমাত্র ওই ঘড়িটি ছাড়া, যা সে ঘুমের মধ্যে বারংবার দেখেছে। ঝাঁপ দেওয়ার আগের মুহূর্ত অব্দি।

পরীক্ষামূলকভাবে সে ঘড়িটিকে ইচ্ছে করে দু'দিন তার দিদির বাড়িতে রেখে আসে। আর কী আশ্চর্য! ওই দু'দিন সে নির্বিঘ্নে ঘুমায়।

আবার যেদিন ঘড়ি ফিরে আসে তার কাছে, দুঃস্বপ্ন আবার শুরু হয়। এবার সুমন্তের মনে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। এ ঘড়ি নিশ্চিত তাকে কিছু ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করছে।

সেদিন রাতে আবার সেই এক স্বপ্ন। বহুতল, কালো ব্রিফকেস, হাই-প্রোফাইল লোকজন, কাচের খোলা উইংগস এবং ঠিক দুপুর বারোটায় উইংগস ধরে লাফিয়ে পড়া এবং পড়ার সময় লর্ডস টাওয়ারের নাম এবং ঘড়িতে তারিখ। আচমকা আজকে ঠিক ঘড়িটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায় সুমন্তর, অন্যদিনের মতো মাটিতে পড়ে মৃত্যু হয় না তার।

উঠে তৎক্ষণাৎ টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে উঠে পড়ে সে। চোখেমুখে জল দিয়ে ল্যাপটপ খুলে বসে। কোথায় এই লর্ডস টাওয়ার খুঁজে বের করতেই হবে।

গুগলে গিয়ে টাইপ করতেই বিশ্বে যত জায়গায় লর্ডস বিল্ডিং বলে কোনো জায়গা আছে সব ছবি চলে আসে। রাত জেগে একে একে সব দেখতে থাকে সুমন্ত। কিন্তু না, তার স্বপ্নে দেখা লর্ডস টাওয়ারের সঙ্গে একটিরও মিল নেই। টাওয়ারের মাথায় লাগানো ঘড়িটিও খুঁজে পাওয়া গেল না কোথাও। অথচ যদি এই লর্ডস টাওয়ার না খুঁজে পাওয়া যায় তবে কোনোভাবেই ঘটনাস্থল জানা সম্ভব নয় কারণ, শনাক্তকরণের আর কোনো রাস্তা নেই।

সময় এগোতে থাকে। ক্রমশ এক অজানা অবসাদ গ্রাস করতে থাকে সুমন্তকে। যে ধোপদুরস্ত সুমন্তকে কর্পোরেট জগৎ চিনত, সেই সুমন্ত আজকাল খুব অগোছালো। মুখে একরাশ দাড়ি, ভালো করে ট্রিম করা হয় না, পরনের ফর্মালে যেন ইস্তিরি নেই, এমনকি মাঝে মাঝে কলিগরা মুখ দিয়েও বিচ্ছিরি গন্ধ পায়। লোকে বলাবলি করা শুরু করেছে যে সুমন্ত অফিস টাইমে বোধহয় নেশাভাঙ করা শুরু করেছে। আসলে সুমন্ত ঠিক কতটা দিশাহীন হয়ে আছে অজানা মৃত্যুর আশঙ্কায়, কেউ তার খবর রাখে না। কিন্তু এতকিছুর পরেও সুমন্ত যেটা করেনি সেটা হল হাতঘড়িটাকে কাছছাড়া করা, যেন সুমন্তের প্রাণভোমরা লুকিয়ে আছে সোনার চেইনের পুরোনো মডেলের ওই হাতঘড়িটায়। সে সময়ে সময়ে দম দিয়ে চালু করে নেয় ঘড়িটাকে, পাছে বন্ধ হয়ে গেলে তার নিজের হৃৎস্পন্দন থেমে যায়।

এরকম আলুথালু অবস্থায় অফিসে নিজের কেবিনে বসে ছিল সুমন্ত। বাইরে সবাই হাঁটাচলা করছে, মন দিয়ে কাজ করছে। ওই তো বাইরে হিমাংশুকে দেখা যাচ্ছে, নতুন জয়েন করা অভিষেকের সঙ্গে কথা বলছে। সবাই কীরকম প্রাণবন্ত, শুধু সুমন্তর জীবনীশক্তি যেন কেউ কেড়ে নিয়েছে। বাঁ হাত তুলে ঘড়িটাকে একবার দেখে নেয় সুমন্ত।

- স্যার, আসতে পারি?

অভিষেক নক করে।

- কাম ইন।

- স্যার, আজকের ইকোনমিক টাইমসটা দেখেছেন?

- না, দেখা হয়নি। সকাল থেকে রিসার্চ রিপোর্টের মেইল পাঠাতে ব্যস্ত ছিলাম।

- সরকার দেশের তেল-সমস্যা নিয়ে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যা হয়তো এই মাস থেকেই কার্যকরী হবে।

- টেবিলে রেখে দাও। দেখে নিচ্ছি।

আসলে দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না। তাই অভিষেককে কোনোমতে তাড়িয়ে দিয়েছে সুমন্ত। অভিষেকও একগুচ্ছ পত্রিকা টেবিলে রেখে চলে গেল।

সুমন্ত পরের এক ঘণ্টা গুগলে শুধু লর্ডস টাওয়ার খুঁজে বেড়াল। সুমন্ত তখনও জানে না আজ তার জন্য কী অপেক্ষা করে আছে।

জলতেষ্টা পেতে ল্যাপটপের ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে জলের গ্লাস নিতে গিয়েই বিপত্তিটা ঘটল। গ্লাসটা হাত লেগে সোজা পড়ল অভিষেকের রেখে যাওয়া পত্রিকাগুলির ওপর। পত্রিকাগুলি পুরোপুরি ভিজে যাবার আগেই তড়িৎগতিতে সরিয়ে নিতে পেরেছিল সুমন্ত, আর তক্ষুনি একটি পত্রিকার হেডিং তাকে টানল।

বেশ কিছু হেরিটেজ বিল্ডিং-এর নাম পরিবর্তনের তালিকা প্রকাশ করেছে সেই সংবাদপত্র। তাতেই এক জায়গায় লেখা আছে—

আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে ইংল্যান্ডের লর্ডস টাওয়ারের নাম পরিবর্তন করে করা হয় 'স্যার উইলিয়াম টাওয়ার'।

ব্যস, ওইটুকুই যথেষ্ট ছিল। এ যেন 'ডুবতে হুয়ে কো তিনকে কা সাহারা'। সঙ্গে সঙ্গে গুগল এবং সমস্ত তথ্য সুমন্তর চোখের সামনে।

স্যার উইলিয়াম টাওয়ার লিখে সার্চ করতেই পরিচিত ঘড়িটির ছবি সে দেখতে পায়, যেটা সে প্রতিরাতে স্বপ্নে দেখে এসেছে। সে আরও জানতে পারে যে এই উইলিয়াম টাওয়ারের নাম পরিবর্তন করা হয় ১৯৮৮ সালে। তার আগে পর্যন্ত এই বিল্ডিংটির নাম ছিল লর্ডস টাওয়ার। আর তারপর আর একটু খোঁজাখুঁজির পরেই সে জানতে পারে আসল তথ্য যা সুমন্তর সমস্ত শরীর দিয়ে উত্তেজনার পারদ ছুটিয়ে দেয়।

এই লর্ডস টাওয়ারের ঠিক পাশেই আছে স্কাইরাইজ গ্লোবাল টাওয়ার, যার উচ্চতা ৭৮ তলা পর্যন্ত। ১৯৮৭ সালে ১৯শে অক্টোবর ইতিহাসে 'ব্ল্যাক মানডে' বলে পরিচিত। সেদিন পৃথিবীর সমস্ত স্টক মার্কেটে ধস নামে। কোটি কোটি ডলার নিমেষে উড়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ এক ঘণ্টায় ভিখিরি বনে যায় টাকা হারিয়ে। আর ঠিক সেই কারণে এই গ্লোবাল টাওয়ারে জমায়েত ঘটে বহু মানুষের। যারা ঋণ কাঁধে করে বাঁচতে চায়নি, তারা দলে দলে এই টাওয়ারে এসে ঝাঁপ দিতে শুরু করে। এই টাওয়ার আজকেও সচল, বহুজাতিক এমনকি বহু ফিনান্স কোম্পানির রিজিয়নাল অফিস এই টাওয়ারে অবস্থিত, কিন্তু লোকজন আজও একে সুইসাইড টাওয়ার বলেই জানে।

সমস্ত ঘটনাটা পড়ে মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে আসে সুমন্তর। শুধু ভাবতে থাকে তার গতজন্মের কথা আর ভাবলেই যেন তার গায়ে কাঁটা দেয়। সে তার পূর্বজন্মে আত্মহত্যা করেছিল স্টক মার্কেটে ধস নামার ফলে এবং এই জন্মে সে এই স্টক মার্কেটের একজন প্রতিশ্রুতিমান

রিসার্চার। শুধু পার্থক্য এই যে গতজন্মে সে ছিল ইংল্যান্ডের বাসিন্দা এবং এই জন্মে ভারতের।

ঘড়িটিকে হঠাৎ করেই তার খুব আপন মনে হতে থাকে। গত কয়েক মাস ধরে যে ঘড়িটি তার রাতের ঘুমকে এক দুঃস্বপ্নে পরিণত করেছিল, এখন সেই ঘড়িটি যেন মহার্ঘ্য বস্তু। সুমন্ত আজ জাতিস্মর, শুধু এই সোনার চেইনের পুরোনো আমলের দম দেওয়া ঘড়ির জন্য।

সে-রাতেই সুমন্ত ঠিক করে সে তার পূর্বজন্মের সমস্ত বৃত্তান্ত জানবে। এই সুযোগ সবাই পায় না; যেহেতু সে পেয়েছে, তাই এ সুযোগ সে হারাবে না।

আগামী কিছুদিনের মধ্যেই সে প্ল্যান তৈরি করে নেয়। ইন্ডিয়ান স্টক মার্কেটের একজন রিসার্চার হিসেবে সে লন্ডনে যেতে চায় ওখানকার এক নামি রিসার্চ কোম্পানির সঙ্গে ডিল করতে। যদিও সিনিয়র হিসেবে হিমাংশুরই যাবার কথা ছিল, কিন্তু সেদিকটা ম্যানেজ করে নেয় সুমন্ত। শুধু পূজার ছুটিটা মাটি হবে, কারণ রিসার্চ কমিটি অক্টোবরের মাঝ বরাবর মিটিংয়ের তারিখ ফাইনাল করেছে। তা সে হোক, সুমন্ত তৈরি হতে থাকে।

যথাসময়ে সে এসে পৌঁছয় ইংল্যান্ড। এই প্রথম সে ইংল্যান্ডে এসেছে, অন্তত এই জন্মে তো প্রথমবারই। কিন্তু কেন জানি না দেশটাকে তার খুব চেনা চেনাই ঠেকতে থাকে। মনের দোষ, না কি ঘড়ির ইচ্ছেতেই এরকম হচ্ছে সেটা অবশ্য বলা যায় না। বলা হয়নি, এই সমস্ত যাত্রায় সুমন্ত ঠিক করেছে হাতে ঘড়িটা পড়ে রাখবে এবং যদি গতজন্মের সমস্ত তথ্য সে পেয়ে যায় তবে ফিরে গিয়েই হিমাংশুকে এই ঘড়ি ফিরিয়ে দেবে। কারণ, এরপর এই ঘড়ির কোনো ভূমিকা তার জীবনে থাকবে না। হয়তো অন্য কেউ উপকৃত হতে পারবে।

স্কাইরাইজ গ্লোবাল টাওয়ারে পৌঁছতে পৌঁছতে রাস্তায় সেদিন এগুলিই ভাবছিল সুমন্ত। সকাল সকাল পৌঁছে গেছিল সে। সকাল সাড়ে ন'টায় মিটিং। সময়মতো কোম্পানির মিটিং সেরে নেয় সে। লাঞ্চ আওয়ারে বেরিয়ে লিফট ধরে সোজা চলে আসে ৭৮ নম্বর তলায়। ওখানে ঠিক দু'দিকের মধ্যিখানে ব্ল্যাক মানডে-তে এই বিল্ডিং থেকে ঝাঁপ দেওয়া একশো ঊনষাট জনের নামের একটি তালিকা বানানো আছে; বিল্ডিং কর্তৃপক্ষ তাদের স্মৃতিচারণা করে এই তলার চারদিকে সবার ছোটো ছোটো জীবনী খোদাই করে রেখেছে। সঙ্গে

ছবিও দেওয়া আছে। হাতে একটা স্যান্ডউইচ নিয়ে খেতে খেতে দেখতে থাকে সুমন্ত। এরই মাঝে একজন লোক এসে ইংরেজিতে এই তলায় উপস্থিত সবাইকে জানিয়ে যায় যে ৭৮ তলার উইংগসের কাচ আজকে পরিবর্তন করা হচ্ছে। সবাই যেন নিরাপদ দূরত্বে থাকে।

সুমন্ত বেশ কিছু ছবি আর জীবনী পড়তে পড়তে বিল্ডিংয়ের একদিকে চলে এসেছে। সেখান থেকে স্যার উইলিয়াম টাওয়ারের একদম নিচ অব্দি দেখা যায়। দেখা যায় তার স্বপ্নে দেখা ঘড়িটাকেও। বেলা এগারোটা চল্লিশ বাজে। স্যার উইলিয়াম টাওয়ারের নিচে অনেক লোক জমায়েত হয়েছে। বোধহয় কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে।

সামনেই একজনকে দেখতে পেয়ে সুমন্ত জানতে চায় নিচে কীসের অনুষ্ঠান হচ্ছে। লোকটি জানায়,

- টাওয়ারটির নাম পরিবর্তন হবে। স্যার উইলিয়ামের পরিবার আপত্তি জানিয়েছে কারণ, এই টাওয়ারের ভেতর এমন সব কুকর্ম ইদানীং হচ্ছে যার সঙ্গে স্যার উইলিয়ামের নাম জড়িয়ে রাখতে পছন্দ করছে না তাঁর পরিবার।

সুমন্ত মনে মনে হাসল। এই এক নাম পরিবর্তন তাকে কত ঘোল খাইয়েছে একমাত্র সে'ই জানে। মরুক গে। সে নিজের কাজে মন দিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল দেয়ালে খোদাই করা ছবিগুলি আর জীবনী। আর খুঁজতে খুঁজতেই একটি ছবির সামনে গিয়ে সে আটকে পড়ল। স্রেফ একটা ছবি। জীবনী নেই, এমনকি নামও নেই। নেই কোনো জন্মবৃত্তান্ত। শুধু ওইদিন যে পোশাক ওই ব্যক্তি পরে ছিল, সেই পোশাক পরা ছবি যা তখনকার নিয়ম অনুসারে বিল্ডিংয়ে ঢোকার আগে তুলতে হত। এখনও এই বিল্ডিংয়ে সে নিয়ম আছে, কারণ সকালেই সুমন্ত নিজে ছবি তুলে তারপর এই বিল্ডিংয়ে ঢুকেছে। কিন্তু সে তো নামও লিখে এসেছে, তাহলে তখন কি নাম লেখা হত না? না কি লোকটি অন্য কারও সঙ্গে এসেছিল বলে অপরজনের নাম লেখা হয়েছিল, এরটা আর লেখার প্রয়োজন হয়নি?

বিল্ডিংয়ের গার্ডকে ডেকে কথাটা জিজ্ঞেস করল সুমন্ত। গার্ড লোকটি বৃদ্ধ এবং দেখে মনে হয় বহুবছর ধরে এখানে কাজ করছে। সে জানায় যে সুমন্তের দ্বিতীয় অনুমানটাই ঠিক।

সুমন্তর এক মুহূর্তে মনে হতে থাকে তার এতকিছু করে এখানে আসাটাই তাহলে বৃথা হয়ে গেল। এত বড়ো দেশে সে এবার একটা

মাত্র ছবির ভরসায় কীভাবে লোকটার জন্ম-ইতিহাস খুঁজে বের করবে? তার ওপর, এটাও তো জানা নেই যে লোকটা আদৌ ইংল্যান্ডের বাসিন্দা ছিল কি না।

মনের চাপা ক্ষোভে সে একটা কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। আর দেখতে লাগল স্যার উইলিয়াম টাওয়ারের ঘড়িটাকে। আচমকা কে যেন ডাকতে সম্বিৎ ফিরল তার।

- মি. সেন?

- কে?

- আমি টম।

সুমন্ত পেছনে চেয়ে দেখল সকালে মিটিংয়ে এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

- ইয়েস, টম। মিটিং কি এখন শুরু হবে?

- না, দেরি আছে। আমি ওপরে এসেছিলাম লাঞ্চ করার জন্যে। ওইদিকে একটা দুর্দান্ত রেস্তোরাঁ আছে। আপনাকে দেখলাম এখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই ডাকলাম। লাঞ্চ করেছেন?

সুমন্ত ঘাড় নেড়ে না করতেই মি. টম যেন খুশি হলেন।

- চলুন তবে, করে নেওয়া যাক।

- চলুন।

- ওয়েট, ওয়েট। আমি একটু ওয়াশরুম থেকে আসছি। আপনি এখানে থাকুন। আর প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, আমার ব্রিফকেসটা একটু ধরুন।

মি. টম হাসিমুখে চলে গেলেন।

আরও মিনিট খানেক কাটল। আনমনা হয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল সুমন্ত। এখন কী করা যায় সেটাই যেন সে ভাবছে। কী করে খুঁজে বের করা যায় তার হারিয়ে যাওয়া অতীতকে। সবাই এ সুযোগ পায় না। সে পেয়েছে। তাকে জানতেই হবে তার অতীত।

বামহাত থেকে ডানহাতে কালো ব্রিফকেসটা চালান করে সে হাতঘড়িটার দিকে তাকায়। পুরোনো, কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই। আসার আগে মোহন স্যাকরাকে দিয়ে সোনার চেইনটা পরিষ্কার করে এনেছে সে। সময় এখন ঠিক বারোটা বাজতে এক মিনিট।

তখনই ফায়ার অ্যালার্ম বেজে উঠে। একটা দৌড়াদৌড়ি শুরু হয় চারদিকে। লিফট আটকে যায়। কোন তলায় আগুন লেগেছে বোঝার উপায় নেই। সুমন্ত যেদিকটায় দাঁড়িয়ে ছিল ওইদিকটায় জল পড়ে

পিছল ছিল। এতক্ষণ দেখে শুনে পা রাখলেও এই দৌড়োদৌড়ি শুরু হতেই একটু পেছোতেই পা হড়কায় সুমন্ত। ওইদিকের উইংগসের কাচ খোলা ছিল। ভাগ্য ভালো ছিল, অপারেটর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা লক্ষ করে এবং বোতামে চাপ দেয়। খোলা কাচের জানালা জায়গায় আসতে থাকে, সুমন্ত পিছলে উইংগসের বাইরে যেতে থাকে। অনেকেই ঘটনাটা দেখতে পায়, কেউ কেউ সুমন্তকে আটকাতে গিয়ে নিজেই পিছলে পড়েছে।

জানালা এক সময় এসে লাগে সঠিক অবস্থানে, বন্ধ হয় উইংগস। কিন্তু ততক্ষণে সুমন্ত সহ আরও দু'জন উইংগসের বাইরে ছিটকে গেছে।

এবার সুমন্তের শুধু নিচে গড়িয়ে পড়ার পালা। আজকেও কালো চিলের মতোই লাগছে তাকে। কালো ট্রাউজার্স, কালো ব্লেজার, কালো চশমা। ব্রিফকেসটা ওপরেই পড়ে আছে, মি. টমের জন্য।

নিচে নামতে নামতে হাওয়ার দাপটে যখন চশমাটা উড়ে যায় তখন সুমন্ত কোনোক্রমে দেখতে পায় স্যার উইলিয়াম টাওয়ারের ফলক নামছে, আর সেই জায়গায় আবার বসছে লর্ডস টাওয়ারের নাম। ঘড়িতে এখন বারোটা বেজে এক, তারিখ ১৯শে অক্টোবর, ২০১৮। এ সেই দৃশ্য যা সে এতদিন ধরে স্বপ্নে দেখেছে। কিন্তু তাহলে তো তার অতীত মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে! এই ঘড়ি অতীত দেখায়, না কি ভবিষ্যৎ, না কি বর্তমান? মাথা আর কাজ করছে না সুমন্তর। একটা ঘুম চাই, অনেকদিন ভালোভাবে ঘুমানো হয়নি।

পাঁচ... চার... তিন... দুই...

এ-ক-ক-ক!

***

ঘুম যখন ভাঙে তখন সুমন্ত মাটিতে। কোনোক্রমে উঠে দাঁড়িয়েছে। আশেপাশে অনেক লোকের ভিড়। পুলিশ আর সাইকোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট এসে সাধারণ মানুষের শক কাটাচ্ছে চোখের সামনে আঙুল ধরে। কারও বা চোখে টর্চ মারছে তারা। সুমন্ত শুধু খুঁজছে জিনিসটাকে, ঘড়িটাকে। ওই তো, ওখানে পড়ে আছে। সেদিকে এগোনোর আগেই সে দেখল কালো ব্লেজার আর কালো ট্রাউজার্স পরা একজন লোক এসে ঘড়িটাকে তুলে নিল। কালো চশমা পরে ঘড়িটাকে

কোটের পকেটে চালান দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে লাগল, মাঝে শুধু একটিবারের জন্য পেছনে ফিরে চেয়ে মুচকি হাসল। সুমন্তের মনে হল, এই হাসি শুধু তার জন্যই হাসা, হিমাংশু তার ঠাকুরদার সোনার চেইনের ঘড়ি নিয়ে চলে গেল।

সুমন্তর আগাগোড়া সব মনে পড়ল, তার হাতে হিমাংশুর বিনা বাক্যব্যয়ে এই ঘড়ি তুলে দেওয়া, তার কেবিনে অভিষেকের ইকোনমিক্স টাইমস নিয়ে আসার আগে হিমাংশুর সঙ্গে কথোপকথন, এমনকি ইংল্যান্ডে আসার সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে দেওয়া। এ'ও সে বুঝতে পারল কীভাবে দম দেওয়া ঘড়ি এতদিন স্টোররুমে পড়ে থেকেও ঠিকঠাক চলছিল।

সব, স-অ-ব সে বুঝতে পারল, শুধু বুঝতে পারল না একটা জিনিস—

এই সোনালি ঘড়ি তাকে আদৌ কোন কাল দেখাচ্ছিল? অতীত, না কি ভবিষ্যৎ! জানা নেই।

ততক্ষণে সুমন্তর থেঁতলে যাওয়া শরীরটাকে জড়ো করে পুলিশ অ্যাম্বুলেন্সে চালান করেছে।

জন্ম ত্রিপুরার। শৈশব কেটেছে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায়। পড়াশোনা রাজন্য ঐতিহ্যবাহী উমাকান্ত একাডেমি বিদ্যালয়ে। বিজ্ঞান বিভাগের কৃতি ছাত্র। পরবর্তীকালে কারিগরি বিদ্যা নিয়ে স্নাতক। বিদ্যালয় জীবন থেকেই লেখার হাতেখড়ি।

পরবর্তীকালে কলেজ জীবন থেকে 'ব্ল্যাকবোর্ড' পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক হিসেবে কাজ করার শুরু। একসময় চুটিয়ে করেছেন গ্রুপ থিয়েটার। বড়দের জন্য গল্প লেখার শুরু তখন থেকেই।

প্রথম প্রকাশিত গল্প 'ত্রিকালদর্শী' এবং প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'চতুর্থস্তম্ভ' যথাক্রমে ২০০৭ এবং ২০১২ সালে। তখন থেকেই প্রেম-অপ্রেম, রহস্য-থ্রিলার, জীবনমুখী সমাজের সব লেখাতেই সমান স্বচ্ছন্দ। কিন্তু তাঁর ফিকশান নিয়ে বাংলায় লিখে চলেছেন উল্লেখযোগ্য লেখা।

ছোটদের জন্যে লিখেছেন 'কিশোর-ভারতী', 'সন্দেশ'-র মত ঐতিহ্যবাহী পত্রিকাগুলোতে। ত্রিপুরার 'শিশুমহল'-র জন্য একবছর টানা লিখেছেন জনপ্রিয় কমিকস কলাম সিরিজ। এছাড়াও বিভিন্ন সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে একাধিক জনপ্রিয় গল্প। 'শেষ গল্প'-র মত অন্য ধারার গল্প লিখে বাংলা সাহিত্যের লেখক পাঠক নির্বিশেষে পেয়েছেন অকুণ্ঠ ভালোবাসা। 'চন্দ্রহাস' গ্রন্থের জন্য দেশ বিদেশের পাঠকের কাছে সমাদৃত হয়েছেন। একাধিক অডিও স্টোরিতে পাঠ হয়েছে তাঁর লেখা। তাঁর লেখা থেকে ভবিষ্যতে তৈরি হতে চলেছে চলচ্চিত্র ও ওয়েব সিরিজ।

বর্তমানে চাকুরীসূত্রে কলকাতানিবাসী এবং সময় পেলেই বিভিন্ন পরিচিত পত্রিকা ও ওয়েবজিনের জন্য কলম তুলে নেওয়া নিয়মিত অভ্যেস। গল্পের খোঁজে দেশ চষে বেড়ানো সাম্প্রতিককালে নেশায় পরিণত হয়েছে।

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ - 'গল্পের ছদ্মবেশ', 'চন্দ্রহাস', 'চন্দ্রহাস ২: মহাকাল', 'দেবীরাক্ষস', 'মৃত-কৈটভ', 'উদ্ভব লিঙ্গ' ইত্যাদি।

প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রাপ্তমনস্ক পাঠক ছাড়া
এই বই কেউ পড়বেন না।
এই গ্রন্থ বাংলার প্রথম পাপ সংকলন। গল্পগুলো পড়তে বসে
মনে হবে পাপ এসে গলা জড়িয়ে ধরেছে।
সেই ফাঁসে ছটফট করবেন পাঠক।
কাজেই সাবধানে পড়বেন।